সন্দীপন

ঢাকা

রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুল

সন্দীপন

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল বাঘিকী

১৯৭৭

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ
রেসিডেনসিয়েল মডেল স্কুল,
ঢাকা—৭

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রী খগেন্দ্র কুমার সরকার
প্রভাষক, কারুকলা

মুদ্রণে ঃ
বাংলা বিভাগ ঃ
বাংলা একাডেমী মুদ্রণ শাখা, ঢাকা
ইংরেজী বিভাগ ঃ
বুক প্রোমোশন প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা

আমাদের অধ্যক্ষ

আমাদের অধ্যক্ষের বাণী

স্বাধীনতাত্তোর দিনগুলোতে শিশু ও তরুণদের এলোমেলো ভাবনা-চিন্তাকে গুছিয়ে প্রকাশ করার আকুল আগ্রহ আকুলি-বিকুলি ক'রে মরছিল ছাত্রাবাসগুলোর দেওয়াল পত্রিকার মধ্যে। অনিবার্য কারণবশতঃ এই সব ক্ষুদে লেখকদের অভিজ্ঞতাকে ছাপার অক্ষরে দেখার মিষ্টি মধুর স্বপ্ন-সাধ মেটানো এতদিন সম্ভব হয়নি, শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। যাহোক, বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত পেরিয়ে আমাদের বিদ্যালয় বার্ষিকী পত্রিকা "সন্দীপন" নামে আত্মপ্রকাশ করল, আর সেই সঙ্গে জ্ঞান-সাধনার আর একটি নতুন দিগন্ত আবার নতুন করে উন্মোচিত হ'ল সম্ভাবনাময় সৃজনশীল শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে। তাদের অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান-পিপাসা, সর্বোপরি, সাহিত্য-কর্ম প্রচেষ্টাকে "সন্দীপন" সন্দীপিত, উদ্দীপিত করেছে দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। আরও বেশী আনন্দ, আরও বেশী গর্ব অনুভব করব যদি অপরিপক্ক হৃদয়ের কল-কাকলি নিরলস সাধনার মাধ্যমে ঝর্ণাধারার সহজ সরল গতিছন্দে বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। সেই চরম আনন্দানুভূতির মুহূর্তটির জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম। "সন্দীপন" দীর্ঘজীবি হোক, ছাত্রদের চিন্তার ফসল সমৃদ্ধ হোক, সার্থক হোক, সুন্দর হোক--একান্তভাবে কামনা করি।

যাঁদের ঐকান্তিকতার যাদুস্পর্শ "সন্দীপন" প্রকাশিত হলো তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ

দু'টি কথা

শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত বুদ্ধিগত, মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক গুণাবলীর সুসমঞ্জস বিকাশের এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে। এই বিদ্যায়তনে শিক্ষার স্তর প্রাথমিক হতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিস্তৃত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মানবিক ও বিজ্ঞান---এ দুটি শাখায় শিক্ষা দান করা হয়।

এটি একটি আবাসিক বিদ্যায়তন। এখানে ছাত্রদের জন্য রয়েছে পাঁচটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাউস (ছাত্রাবাস)।

বিদ্যানিকেতনের মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সহ-পাঠ্যক্রম যথা, প্রাতঃকালীন শরীরচর্চা, বৈকালিক খেলাধূলা, জিম্‌নাস্‌টিক্‌স, স্কাউটিং, কাবিং, স্কুল ব্যাণ্ড, জুনিয়র রেডক্রস, বার্ষিক তাঁবুবাস, বার্ষিক ক্রীড়া, বক্তৃতা, বিতর্ক, আন্তঃশ্রেণী ও আন্তঃ-হাউস এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, সখ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চা, বার্ষিকী প্রকাশনা, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ছাত্র-শিক্ষকদের সাপ্তাহিক সমাবেশে স্কুল ব্যাণ্ড সহকারে ছাত্রদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, সাপ্তাহিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা, সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ ও বিদ্যালয় সংবাদ পরিবেশন ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপর প্রতিবেদন পাঠ করা হয় এবং পরিশেষে মাননীয় অধ্যক্ষ তাঁর উপদেশ বাণীতে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য, বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃংখলা, ঐতিহ্য, ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন এবং শিক্ষার্থীদের জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই অনুষ্ঠানে সকল ছাত্রের মাতাপিতা, অভিভাবক, প্রাক্তন ছাত্র, শুভাকাঙখী ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত হ'য়ে অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করেন।

এই বার্ষিকীতে যে সব লেখা রয়েছে সে সবের অধিকাংশই হচ্ছে অপরিণত বয়সের ছাত্রদের সবুজ মনের কোমল আত্মপ্রকাশ। এতে ত্রুটি বিচ্যুতির অবকাশ রয়েছে। সমাজের কাছে এদের ছোট প্রাণ, ছোট কথা নিতান্তই সহজ সরল হলেও এরাই একদিন জাতিকে দেবে নতুন আশার আলো। এ আশা নিয়েই 'সন্দীপন' প্রকাশিত হলো।

শাহ মুহম্মদ জহুরুল হক
উপাধ্যক্ষ

সম্পাদকীয়

আমরা মানুষ। বুকের অভ্যন্তরে আমরা লালন করি একটি সুন্দর মন। যেমন ভাবে আবেগে, হরষে বিষাদে মন কথা বলে, তেমনি অনুভূতির বীজ দিয়ে, উপলব্ধির লাঙল দিয়ে চেতনার রৌদ্রে ফসল বোনে। সে ফসল কবিতা, গান, গল্প হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সে ফসলে সমৃদ্ধ হয় জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডার।

একটা মন যখন সীমাহীন কর্মের কোলাহলে মুখরিত থাকে, তখন সেই অনুভূতিগুলো কোথায় যেন পালিয়ে যায়, হারিয়ে যায়; আমরা তখন যন্ত্র হই। কিন্তু যন্ত্র মানুষের শেষ পরিণতি নয়, হতে পারেনা। তাইত কর্মকোলাহলের খণ্ড অবকাশে সে অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে রাখতে হয়। চৈতন্যের দুয়ারে যেতে হয়--মৃদু হোক, দ্রুত হোক, যেতেই হয়। এভাবেই আমরা সাহিত্য গড়ি, সংস্কৃতি গড়ি।

আমাদের এই পত্রিকা "সন্দীপন"-এ আমরা সেই অনুভূতির মন নিয়েই কথা বলতে চেয়েছি। কতটুকু পারিনি সে বিচারের ভার পাঠকের। কথাগুলো পড়তে যদি পাঠক হোচট খান, থমকে দাঁড়ান তবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পাঠকগণ সহৃদয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আবার বলি আমরা মানুষ, ভুল তো হবেই।

নতুন মেধার মেলা বসিয়েছি।
তাই প্রজ্ঞার মাপকাঠি দেখিনি।

এই এখানে নবাগতদের আসরে চেতনার আলো অনেক অল্প, স্বীকার করি। তবে যদি পাঠকের চেতনা থাকে দেখবেন এ আলোর গভীরতা, আন্তরিকতার পরিমাপে সীমাহীন, অনন্ত। এই অনন্ত পথে আমাদের যাত্রা শুভ হোক।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়; আমরা শৈশব থেকে লালিত হই বাংলা ভাষায়। বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। দেহের অস্তি-মজ্জায় আমরা প্রতিনিয়ত এর স্পন্দন অনুভব করি। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য ভাষা আমাদেরকে উপেক্ষা করতে হবে।

ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আমাদের চেতনাকে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত করতে হলে, বিস্তৃত করতে হলে, আমাদেরকে অবশ্যই ইংরেজীর মাধ্যমে যেতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে এই পত্রিকায় ইংরেজী বিভাগ খোলা হয়েছে। আশা করি এটা সমাদৃত হবে।

সাধ থাকলেও, সামর্থ আমাদের প্রতি প্রসন্ন নয়। সীমিত কলেবরেই আমাদের চেতনার ফসলকে মেলতে হয়েছে। তাই অনেক ছেলের চিন্তার বীজ এ ফসল বুননে আসেনি। সীমিত পরিসরে তাদের লেখা আমরা মুদ্রিত করতে পারিনি। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রইল। কামনা করি, আগামীতে তাদের লেখা দ্বিগুণ প্রত্যাশার সমৃদ্ধি আনবে, আনন্দ আনবে।

এই পত্রিকা একক নয়, যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, সহযোগী ছাত্র বন্ধুদের মিলিত প্রবাহে এর জন্ম, বৃদ্ধি। তাদের সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল।

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ

অধ্যক্ষ কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমদ

সম্পাদনায় ঃ

বাংলা বিভাগ--

মাহবুব জান চৌধুরী-- একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

ইউসুফ কবীর-- নবম শ্রেণী (মানবিক)

ইংরেজী বিভাগ--

ফারুক হোসেন-- দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

নসরুল হামিদ-- অষ্টম শ্রেণী

ব্যবস্থাপনায় ঃ

জনাব শাহ মোঃ জহরুল হক-- উপাধ্যক্ষ

জনাব শেখ মোঃ ওমর আলি-- প্রবীণ প্রভাষক

জনাব আবদুর রাজ্জাক-- প্রভাষক

জনাব মুস্তাক আহমদ-- প্রভাষক

শ্রী শীলব্রত চৌধুরী-- গ্রন্থাগারিক

শ্রী খগেন্দ্র কুমার সরকার-- প্রভাষক (কারু কলা)

সূচী পত্র

বাংলা বিভাগ

ছড়া

বুড়ির উকুনঃ ফয়সল পাশা; রাত পোহাবেঃ আশফাক উদ্দিন; বৃষ্টির ছড়াঃ সাঈদ হাসান রানা; মজার ছড়াঃ শাইয়ুখ সোবহান নূর: দুষ্ট ছেলেঃ শহীদুল ইসলাম; মনে মনে আছাড়ঃ মোঃ সদরুল আলম ভূঁইয়া।

কবিতা

ব্যাঙের সর্দিঃ মামুন খাঁন; শপথঃ এ. কে. এম. মাহাবুব আলম; এইবারঃ মোহাম্মদ মহিব্বুল আলম; অমীমাংসিত কবিতা; মাহবুব জান চৌধুরী; এরা সর্বহারাঃ এস. এস. আলম; আশিঃ সুফি মোঃ শোয়েব; অবসানঃ মোঃ ফেরদৌস আলম; চিরন্তনঃ শাহ মোঃ জহরুল হক।

প্রবন্ধ

বিজ্ঞানের স্বপ্ন রাজ্যেঃ কাজী দীন মোঃ খোশরু; সাম্রাজের পতনঃ আব্দুল হালিম খান; মানবকল্যানে বিজ্ঞান ও ধর্মঃ হিমাদ্রি শেখর সাহা; মহাশূন্যের পথেঃ সালাউদ্দিন আহমেদ; কেঁচোঃ মোঃ শাহ আলম; চারু ও কারু শিক্ষাঃ নূর মোহাম্মদ; জাতি গঠনে খেলাধূলার অবদানঃ নসরুল হামিদ; মধুসূদনের কাব্যে নারী ব্যাক্তিত্বঃ আব্দুর রাজ্জাক।

গল্প

হতোম পেঁচাঃ ইমতিয়াজ মামুদ; টঙ্গীর বিশ্ব এস্তেমাঃ ইফতেখার মামুদ।

কৌতুক

সুড় সুড়ি ঃ মোঃ নজমুল ইসলাম

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক

জুনিয়র রেডক্রস প্রসঙ্গে ঃ ইমাম হোসেন; স্কাউটিং ও কাবিং সম্বন্ধে দু'টি কথা ঃ মোস্তাক আহমদ মানিক; খেলাধূলা ঃ আবদুল গফফার; ১নং ছাত্রাবাস; ২নং ছাত্রাবাস; নজরুল ইসলাম হাউস; ফজলুল হক হাউস; বিদ্যালয় সংবাদ।

ইংরেজী বিভাগ

Flying saucers Fact or Fantasy : Salauddin Ahmed

The Lost Illusion : M . M . Barkatullah

A Moonlit Night : Javed Barkatullah

In Retrospcct : Md . Qamrul Islam

Recollection of the Camping : Faruque Hossain

The Influence of English on our Literature : Mustaq Ahmed Manik

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

ঢাকার অদূরে রাজেন্দ্রপুরে ধানমণ্ডি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ছাত্রদের বাৎসরিক শিবিরে ছেলেদের অংকিত চিত্র দেখিতেছেন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষক; ছেলেদের অবষ্টাকল রেস; রন্ধনশালা ও তাঁবুর সম্মুখে কিশোরদের দেখা যাইতেছে।

বুড়ির উকুন

ফয়সাল পাশা
চতুর্থ শ্রেণী 'ক' শাখা
স্কুল নং ১৮৫৭

বুড়ির মাথায় বেজায় উকুন
তাইনা দেখে শতেক শকুন
বুড়ির মাথায় বসে।
উকুন হলো পাঁচ'শ কুড়ি
চেঁচিয়ে বলে উকুন-বুড়ি
দেখনা অংক কষে।
আরো হলো কয়েক হাজার
খবর শুনে গেলো রাজার
মাথার মুকুট--খসে!

রাত পোহাবে

আশফাক উদ্দীন
চতুর্থ শ্রেণী 'ক' শাখা
স্কুল নং ২২৫৮

নীচের ক্লাশের ছাত্র মোরা
জ্ঞান আমাদের অল্প যে,
যখন মোদের বাড়বে জ্ঞান
কতই কিছু করব যে,
একে একে পার হব ভাই
উপর দিকের ধাপগুলি,
রাত পোহাবে আসবে দিন
হাসবে বাগের ফুলগুলি।

হুতোম পেঁচা

ইমতিয়াজ মাহমুদ
স্কুল নং ১৬১৩
নবম বিজ্ঞান।

শোকে যে মানুষ পাথর হতে পারে তা ফেলু মিয়াকে না দেখলে হয়ত এত বেশী করে কোন-দিন তা উপলব্ধি করতে পারতাম না। সুখ-দুঃখ জীবনের সহচর একথা যেন মন আর মানতে চায় না। দুঃখের পর দুঃখ, সর্বনাশের পর সর্বনাশ যাদের জীবনে নেমে আসে, ঝঞ্ঝা মহামারী যাদের আপনজনকে ছিনিয়ে নেয়, হা-হুতাশ যাদের জীবনে সুখের নীড় রচনা করে, দুঃখই তাদের নিত্য সহচর, সুখ তাদের পর। শোক-দুঃখ, বিরহ-বিচ্ছেদের মূর্ত প্রতীক আমাদের হতভাগ্য বৃদ্ধ ফেলু মিয়া।

কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। সেদিন ফেলু মিয়ারও অবরুদ্ধ আবেগ এমনি করেই পথ খুঁজে পেয়েছিল। গভীর ক্ষতচিহ্ন বহনকারী কঙ্কালসার দেহটা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিল, কিন্তু ফেলু মিয়া হাসপাতাল ছাড়তে পারেনি। গেটের একপাশে দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিয়ে ফেলুর নিথর মানবাত্মা মহাশান্তির অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল। আমি ভেবে পাইনি ফেলু মিয়ার ফেলে-দেওয়া অকেজো দেহটা কিভাবে আব্বার মত পাকাব্যবসায়ীর বৈষয়িক বিবেককে আকর্ষন করল। এমন অঘটন না ঘটলে ফেলু মিয়ার মর্মবেদনা টের পেতাম না; টের পেতাম না আব্বার মানব-হৃদয় ব্যবসাটুকু। দৃষ্টি পড়তেই আব্বা নির্জীব দেহটাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাননি। উত্তর দিয়েছিল এক ঝাড়ুদার। মাসখানেক আগে ওর জ্ঞান ফিরেছিল। সেই থেকে ও নির্বাক। নিজের নাম ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না।

ফেলু মিয়ার দেখাশুনার ভার পড়ল আমার উপর। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তার দৈহিক উন্নতি হল। কিন্তু এতটুকু মানসিক উন্নতি হল না। আব্বা দৈনিক একবার খোঁজখবর নিতেন। সেদিন রবিবার। রিপোর্ট শুনে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফেলু মিয়ার কাছে গেলেন। ফেলু মিয়া ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আব্বার দিকে। তার কি হয়েছিল, কি তার পরিচয়, ইত্যাদি আব্বা তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম আব্বার কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতা ও স্নেহের পরিমাণ দেখে। তাপে বরফ গলে; স্নেহে, শোকে পাথর-হওয়া হৃদয় গলে। ফেলু মিয়ার গণ্ডদেশ বেয়ে তপ্ত অশ্রুবিন্দু গ'ড়িয়ে পড়তে লাগল। তার অশ্রুবিন্দুগুলো এক একটা মুক্তা মনে হয়েছে আমার।

আব্বা চা'য়ের হুকুম দিয়ে এসেছিলেন। এতক্ষণে রফিক চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়াল। বয়স বছর দশেক হবে। কোন একগাঁয়ের নাদুসনুদুস ছেলে। গায়ের রং কলমি লতার ডগার মত। সবে কাল কাজে লেগেছে। রফিক ট্রে হাতে ঢুকতেই ফেলু অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে

চেয়ে রইল। তারপর ডুকরিয়ে কেঁদে উঠল। তিনমাসের মৌনতা ভঙ্গ করে কথা বলল। কথা নয় যেন এক একটি বুলেট। গ্রাম্য ভাষায় সে যা বলল তার সারাংশটুকু লিপিবদ্ধ করলাম। বিধৃত করতে পারলাম না সর্বহারা হৃদয়ের বেদনা বিক্ষুব্ধ অনুভূতিটুকু। তারও ছিল ঠিক এমনি একটি ছেলে। চৈতালী ঘূর্ণিঝড় তার জীবনদীপ অকালে নিভিয়ে দিয়েছে। তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তার বড় আক্ষেপ যে সে নিজে মরল না কেন? সে তো চেয়েছিল সর্বগ্রাসী ঝঞ্ঝার সব আক্রোশ নিজের বুকে পেতে নিতে। তবু কেন, ঝঞ্ঝা তার একমাত্র সন্তানকে মরন ছোবল মারল? তার স্পষ্ট মনে পড়ে সেই ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যের সময় সে ছনপাতার ঘরে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে একটি বাঁশের খুঁটিকে অবলম্বন করে প্রচণ্ড শক্তিধর দৈত্যদানবের সাথে যুঝেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কোথা থেকে কি উড়ে এসে আঘাত হানল বাপ-বেটাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরেছে ঢাকার হাসপাতালে এসে। যেদিন জানতে পারল যে তার আদরের মনু বেঁচে নেই, সেদিন থেকে সে পাথর হয়ে গেছে।

বাঁধন হারা কান্না বাধা মানতে চায় না। আমরা পিতাপুত্র নির্বাক। সান্ত্বনার ভাষা নেই আমাদের মুখে। হটাৎ ফেলু আব্বার পা জড়িয়ে ধরে বলল--"হুজুর, দয়া করে আমাকে তাড়াবেন না। এর মুখ চেয়েই আমি বাঁচব।"

আব্বা ফেলুকে তাড়িয়ে দেননি। উনি যে বানিজ্যকেন্দ্রের সেক্রেটারী সেই কেন্দ্রের দোকান-গুলোর পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন তাকে। রাতে সে নিষ্ঠার সাথে পাহারার কাজ করত। সকালের দিকে ঘুমাত। বিকেলে সংসারের টুকিটাকি কাজ করত। স্কুল থেকে এসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তার সাথে আলাপ করতাম। সে আমাকে কি বলে ডাকবে ভেবে পেতো না। কখনো "ছোটসাহেব" কখনো "আব্বুজী" আবার কখনো বা বাবাজী বলে ডাকত। তাকে চাচা বলে ডাকতে আমারও মন চাইত। কিন্তু আবাল্য-শিক্ষা ও রুচিতে বাধত। তবুও আমাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটত না। আলাপ করে জেনেছিলাম, ফরিদপুরের অধিবাসী সে। গরীব কৃষকের ঘরে জন্মেছিল দারিদ্র্যের চামচ মুখে নিয়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে আজন্ম সংগ্রাম। বারবার পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হয়নি কখনো। অদৃষ্টের সাথেও সে লড়েছে বহুবার। সেখানেও ঘটেছে তার পরাজয়। রাক্ষুসী পদ্মা কেড়ে নিয়েছে তার চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি। মহামারী কেড়ে নিয়েছে স্ত্রী ফুলজানকে। তারপর সবশেষে ঘূর্ণিঝড় নিয়েছে তার আদরের একমাত্র সন্তান মনুকে। তার জন্য দু'ফোটা চোখের পানি ফেলার কেউ রইল না। দুনিয়াতে তবু সে দাঁড় করাতে চাইছে তার নুব্জ দেহটাকে, রফিককে কেন্দ্র করে।

আগেই বলেছি অনেকের জীবনে দুঃখের পর দুঃখই আসে, সুখ আসেনা। আসেনি ফেলুর জীবনেও। যে হৃদয়ে অতৃপ্ত পিতৃস্নেহ সঞ্চিত ছিল সেই হৃদয়েই অদৃষ্টের অমোঘ নির্দেশেই অনেকগুলো দুঃখের সাগর সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বশেষ সাগর সৃষ্টি হয়েছিল রফিকের মৃত্যুতে। সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই রফিক একদিন তার দাদীর সাথে গুলিস্তানে বেড়াতে গিয়েছিল; আর ফিরে আসেনি। রাস্তা পার হতে যেয়ে তার মাথার মগজ ছিটকে পড়েছিল লরীর চাকার চাপে। আমরা খবরটা দিতে পারিনি ফেলুকে। তিনদিন পর এক ঝি'য়ের কাছে খবরটা সে পেয়েছিল। তারপর আমাদের পিতাপুত্রকে "নিষ্ঠুর" বিশেষণে বিশেষিত করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সপ্তাহখানেক পরে খবর পেলাম নতুন পাহারাদারের কাছ থেকে। সে ফেলুকে চিনতো। তার ভাষায়, ফেলু আর মানুষ নেই। সে হুতোম পেঁচায় পরিণত হয়েছে। সেদিন রাত্রিতে পাহারা দেয়ার সময় হুতোম পেঁচার অশুভ হৃদয়বিদারক হা-হুতাশ শুনে পাহারাদার চমকে উঠেছিল। ভয়ে তার রক্ত হিম।

বহু অনুসন্ধান করেও সে কোন হুতোম পেঁচার টিকি দেখতে পায়নি। শেষে আবিষ্কার করেছিল ফেলুকে। তারই কণ্ঠস্বরে আজও হুতোম পেঁচা সর্বহারা মানবাত্মার ব্যাথা-বেদনাকে প্রকাশ করতে চাইছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর অন্ধকারে, নিশুতি রাতে।

গ্রামবাংলা : সালাহউদ্দিন আহমেদ, অষ্টম শ্রেণী

বিজ্ঞানের স্বপ্নরাজ্যে

কাজী দীন মোহাম্মদ খোশরু
দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান শাখা
স্কুল নং ২৩০০

কার্বন--ডাই অক্সাইড। কার্বন চক্র। দ্বিপ্তী সংশ্লেষণ।

—"ধ্যাৎ! এ ছাই পাশ বিজ্ঞান আবার মানুষ পড়ে। কিচ্ছু বুঝি না। কেন যে আব্বার কথায় "বিজ্ঞান শাখা" বেছে নিয়েছিলাম। রেগে অস্থির হয়ে উঠে দশম শ্রেণীর ছাত্র কাশেম। সামনে পরীক্ষা। তার উপর আগামী কাল প্রিন্সিপ্যাল সারের ক্লাস টেস্ট। রাত বাড়ছে। ঘুম আসছে। কিন্তু কিছুতেই কাশেম কার্বন চক্র, দ্বিপ্তী সংশ্লেষণ বুঝতে পারছে না। তবুও পড়তে পড়তে বুঝতে চেস্টা করছে কাশেম।

রাত গভীর। হটাৎ কাশেম দেখল তার টেবিলের উপর খুব ছোট দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে হাত ধরাধরি করে নাচছে। ছেলেটি ভীষণ কালো আর তার হাত চারটি। মেয়ে দুটি বেশ ফরসা, হাত দুটি।

—তোরা কে?—কাশেম জিজ্ঞাসা করল।

—"আমার নাম কার্বন"—ছেলেটি বলল।

—"আমরা অক্সিজেন"—মেয়ে দুটি বলল।

—"আমরা তিন জনে মিলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড।"—ছেলেটি দু'হাত দিয়ে একটি মেয়েকে আর বাকী দু'হাত দিয়ে আর একটি মেয়েকে ধরে কাছাকাছি টেনে নিয়ে জবাব দিল।

কাশেম অবাক হল। হটাৎ দেখল ওরা তাকে সালাম করছে আর বলছে—আপনি আমাদেরকে একতাবদ্ধ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে সালাম।

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনি। ঐ দেখুন আপনার নাকের ভিতর দিয়ে আমার মত আরও কত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হচ্ছে।

কাশেম দেখল বাতাসে অক্সিজেন মেয়েগুলি উড়ছে আর তার নাকের ভিতর ঢুকছে। একটু পরেই ওরা কালো কার্বনের সাথে হাত ধরাধরি করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে বের হচ্ছে। হাজার, হাজার। লক্ষ, লক্ষ। ওরা সবাই কাশেমকে তাদের সংগে বেড়াতে যেতে অনুরোধ করল। কাশেম তাদের সাথে উড়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডগুলো চিৎকার করতে শুরু করল।

—বাঁচাও! বাঁচাও!!

কাশেম দেখল কতগুলো গাছ ওদের ধরে ধরে পাতার মধ্যে রাখছে। সেখানে ছোট ছোট কত-গুলো ছিদ্রের মধ্যে পানি ঢালছে গাছ তার শিকড় দিয়ে মাটি থেকে এনে। সূর্যের আলোকে সেই পানিগুলি টগবগ করে ফুটছে। পাতার মধ্যে সবুজ একটা ছেলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডগুলোকে ধরে ধরে ফুটন্ত টগবগে পানিতে জোর করে ঢেলে দিচ্ছে। কাশেম রেগে গেল। চিৎকার করে বলল---"এই গাছ। আমি ওদের তৈরী করেছি, সেটাকি নষ্ট করার জন্যে? আর তোমার পাতার মধ্যে বসে কাজ করছে এই সবুজ রং-এর ছেলেটা কে?"

গাছ কাঁপতে কাঁপতে বলল--"দেখুন। অপরাধ নেবেন না। আমি আমার খাবার কার্বোহাইড্রেট করার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ধরে রান্না করছি। আমি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কালো ছেলেটাকে মেরে খাবার তৈরী করি। আর ঐ অক্সিজেন মেয়েগুলোকে বাতাসে ছেড়ে দেই। ঐ অক্সিজেন না হলে যে আপনিও বাঁচতে পারবেন না। আপনার শ্বাস গ্রহনের সময় ওদের ভীষন প্রয়োজন। এই মেয়েগুলো আমাদের, আপনাদের, জীবজন্তু সবার শ্বাস গ্রহনের জন্য দরকার। তাই ওগুলো আমরা বাতাসে ছেড়ে দিই। ওগুলো উড়ে বেড়াক। প্রয়োজন মত আপনি, আমি, পশু-পক্ষী সবাই ওগুলোকে শ্বাস নেওয়ার সময় গ্রহণ করব।---"

---"তা বুঝলাম।"--কাশেম একটু নরম হল। --"কিন্তু গাছ! তোমার কি করে খাবার তৈরী কর? আর আমাদের জন্য ঐ অক্সিজেন মেয়েগুলোকে কি করে আলাদা কর? তুমি ত' আমাদের খুব উপকার কর তাই না?"

---হ্যাঁ। ঐ যে সবুজ ছোড়াটা আমার পাতায় বসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডগুলোকে গরম পানিতে সিদ্ধ করে খাবার রান্না করছে, ওর নাম ক্লোরফিল। ঐ দেখুন গরম পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কার্বন নামক কালো ছোড়াটা কেমন গলে যাচ্ছে। আর অক্সিজেন নামক মেয়েগুলো কি সুন্দর ভাবে গরম পানি থেকে লাফিয়ে উঠে বাতাসে উড়ে চলে যাচ্ছে!--কাশেম দেখল, পাতার মধ্যে গাছের খাবার কার্বোহাইড্রেট তৈরী হয়ে গেছে। গাছের পাতার মধ্যে শিরা উপশিরা দিয়ে খাবারগুলো গাছের সারা দেহে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অক্সিজেন মেয়েগুলো আবার বাতাসে উড়ছে।

গাছ বলল--"হুজুর! আমরা গাছেরা কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সূর্যের আলোকে ক্লোরফিলের সাহায্যে কার্বহাইড্রেট নামক খাবার তৈরী করি। এই পদ্ধতিকে আপনারা মানুষ জাতি নাম দিয়েছেন --"দ্বিপতী সংশ্লেষণ' বা "সালোক সংশ্লেষণ"। আমরা আপনাদের ভীষণ উপকার করি, আর অবশ্য আপনারাও আমাদের উপকার করেন।"

---সে কি রকম?

---ঐ যে, আমরা মানুষ, পশু-পাখী সবাইকে আমাদের খাবার তৈরী করার পর অক্সিজেন দিই, আর আপনারাও আমাদেরকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিচ্ছেন আমাদের খাবারের জন্য। সুতরাং আমরা এবং আপনারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আসুন আমরা বন্ধু হই। কাশেমের মাথায় সেই বই-এর কথাটা মনে এল।--"আমরা শ্বাস গ্রহনের সময় গ্রহণ করি অক্সিজেন, ছাড়ি কার্বন-ডাই-অক্সাইড। আর গাছ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সময় গ্রহণ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ছাড়ে অক্সিজেন। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন স্থিতিশীল থাকার কারণ এটা। এইরূপে যে প্রক্রিয়ায় বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হ্রাস-বৃদ্ধি হ'য়ে সমতা রক্ষা হয়, তাকে কার্বন চক্র বলা হয়।"

কাশেম খুশী হয়ে গাছেকে জড়িয়ে ধরতে যাবে এমন সময় সে হটাৎ লক্ষ্য করল ৮-১০ জন স্কুলের ছেলে-মেয়ে সেই গাছটির গোড়ায় আগুন লাগিয়ে দিল। আর তারা আনন্দে হাসছে।

গাছের উপর ক্রুদ্ধ অক্সিজেন মেয়েগুলোও তাদের দু'হাত দিয়ে সেই আগুনকে সাহায্য করছে আরও বেশী দাউ দাউ করে জ্বলতে। গাছটি চিৎকার করে উঠল---কাশেম বন্ধু, বাঁচাও। বাঁচাও!! তোমরা বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন আছে।"

কাশেম দেখল গাছটি পুড়ে যাচ্ছে। পাতার সবুজ ক্লোরফিলগুলো মরে যাচ্ছে। আর পোড়া গাছের ভিতর দিয়ে কালো কালো কার্বনগুলো বেরিয়ে এসে বাতাসের অক্সিজেন মেয়েগুলোর সাথে হাত ধরাধরি করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হয়ে বাতাসে হাসতে হাসতে উড়ে বেড়াচ্ছে। কাশেম কিছুক্ষণ 'থ' হয়ে থাকল। তার মাথায় বিজ্ঞান বই-এর কার্বন চক্র আর দ্বিপ্তী সংশ্লেষণ ক্রিয়া সবই পরিষ্কার হয়ে উঠল। সে বিড় বিড় করতে লাগল, "কার্বন চক্র" "দ্বিপ্তী সংশ্লেষণ"।

হটাৎ আম্মার ধাককায় কাশেমের ঘুম ভেঙে গেল।

—"এই কাশেম! পড়তে বসে ঘুমান হচ্ছে! ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বার বার "কার্বন চক্র" আর "দ্বিপ্তী সংশ্লেষণ" বলছিস কেন? রাত হয়েছে। চল ভাত খাবি"—।

কাশেম বিজ্ঞান বইটা বন্ধ করতে করতে বলল---"বিজ্ঞান খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেকট তাই না মা?"

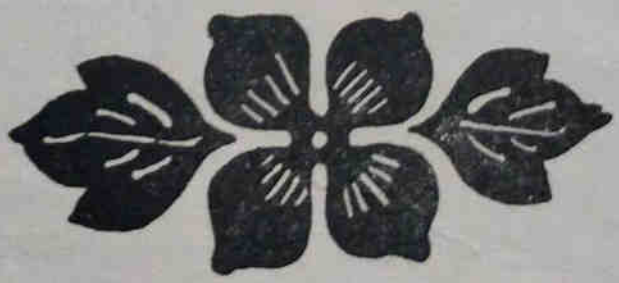

বৃষ্টির ছড়া

সাঈদ হাসান রানা
পঞ্চম শ্রেণী 'খ' শাখা
স্কুল নং ১৮০৮

বিষ্টি তো পড়ছে,
পড়ছে তো পড়ছেই;
দিন নেই, রাত নেই
অঝোরে তা ঝোরছেই।
ভিজে সারা কাক চিল,
ভরে গেল খালবিল;
ডুবে গেল সৃষ্টি।
থামে না তো বৃষ্টি।

মজার ছড়া

শাইয়ুখ সোবহান নূর
তৃতীয় শ্রেণী 'ক' শাখা
স্কুল নং ২০২১

খোকন সোনার বায়না,
যাবে সে যে চায়না,
সেখান থেকে আনবে কিনে
চকচকে এক আয়না।

ম্যাগাজিন কমিটি

সাম্রাজ্যের পতন

আব্দুল হালিম খান
স্কুল নং-২২৭৫, দ্বাদশমান
মানবিক বিভাগ।

উত্থান-পতন জগতের চিরন্তন রীতি। আজ যে জাতি শৌর্য্যেবীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে-প্রাচুর্য্যে, যশ ও সুখ্যাতিতে ভরপুর কালই হয়তো পরিপক্ক চুল, ঘোলাটে চোখ, শীর্ণ দেহ প্রভৃতি কতিপয় অচিন্তনীয় ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে তার অবসান ঘটবে। মানব-জাতির এসব উত্থান-পতনের কারণ, কাহিনী ও ফলাফল গর্ভে ধারণ করেই ইতিহাস আজ গর্বিত, তবে ইতিহাসের গর্ব আমাদের জন্যে হলেও আমরা ইতিহাসকে উপেক্ষা করি। ইতিহাসের গর্বে আমরা গর্বিত হইনা। তা না হলে ইতিহাসের মর্মবাণীর প্রতি আমাদের চোখ-কান বন্ধ করার হেতু কি?

জন্মকাল হ'তেই ইতিহাস মানব-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ ও ব্যাথা-বেদনাকে ধরে রেখেছে একান্ত আপনার করে। সে আপনার ধর্মানুসারেই জানাচ্ছে তার অভিজ্ঞতা। কিন্তু কোন সাম্রাজ্যই পতনের তূহীন ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পায়নি। কারণ ইতিহাসের শিক্ষার প্রতি অবহেলা। তবে কেউ কর্ণপাত করুক বা না-ই করুক ইতিহাস সত্যিতে নিবেদিত প্রাণ। তৃষ্ণার্ত পথিকের প্রয়োজনের তুলনায় স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ বারিধারার পরিমান অনেক বেশী, কিন্তু ভয়ে কিংবা আলস্যভরে যদি কেহ তীরে বসে বারিধারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই রাখে তবে তৃষ্ণার অবসান সম্ভব হবে কি? এজন্য তাকে পথ বে'র করতে হবে; স্রোতস্বিনীর বারিধারার সংস্পর্শ লাভের জন্য। ইতিহাস এ পথ খুঁজতে সাহায্য করে।

উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয় বংশ, দিল্লী সালতানাত, মুগল সাম্রাজ্য এবং আরও কতিপয় সাম্রাজ্যের কিংবা রাজবংশের স্মৃতি বর্তমান পৃথিবীও বহন করছে। নিঃসন্দেহে এসব সাম্রাজ্যের কতিপয় শাসকের শাসনকাল ঐশ্বর্য্যে-প্রাচুর্য্যে, শক্তি-সামর্থে ও কীর্তিতে এতই জমকালো ছিল যে তা ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু তাদেরও হয়েছে পতন ও হয়েছে ধ্বংস। শুধু মাত্র নিরপেক্ষ ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যে দিয়েই এসব সাম্রাজ্যের পতনের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এভাবে পৃথিবীর প্রতিটি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করলে ক'টি সাধারণ নিয়ম দেখা যায়। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির ভিতর ধর্মগত মিল তো আছেই বরং অনেক সময় আকারগত মিলও দেখা যায়।

সামরিক বাহিনীর অবনতি কিংবা তার প্রতি অবহেলা প্রায় প্রতিটি সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। উমাইয়া বংশ সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বংশের শেষের দিকের খলিফাগণ সামরিক বাহিনীর দর্প বজায় রাখতে পারেননি। দ্বিতীয় মারওয়ানের সামরিক বাহিনীর দূর্বলতাই ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন

ডেকে আনে। আব্বাসীয় বংশের শেষের খলিফাগণের সামরিক বাহিনীর প্রতি ঔদাসীন্যই তাঁদের সাম্রাজ্য পতনের বীজ বপন করে। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার জন্যই ভারতবর্ষে দিল্লী সালতানাত এবং মুগল সাম্রাজ্য ও রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আবার সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা দেখা দিলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও আত্মকলহের সূচনা হয়। এবং অনিবার্যভাবেই বহিঃশক্তি তখন সাম্রাজ্য আক্রমনের সুযোগ পায়। ইব্রাহীম লোদীর সামরিক বাহিনীর দূর্বলতা বাবরের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজতর করে দেয়। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগেই পারশ্য সম্রাট নাদির শাহ এবং আফগানরাজ আহমদ শাহ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমন করে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। পরিনামে মুগলদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিও সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম সাধারণ কারণ। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী উমাইয়া বংশের একমাত্র দ্বিতীয় ওমরের আমলেই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল জনকল্যাণমূলক। বংশের প্রায় বাকী সব খলিফাগনই রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতেন। বিলাস-ব্যাসন জীবন যাপনে প্রচুর খরচের জন্য রাজকোষে যে শূন্যতা দেখা দেয় তা পূরনের জন্যে খলিফাগন কর বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। ফলে জন-জীবন করভারে জর্জরিত হয় এবং অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। পরিনামে তাদের পতনের পথ উন্মুক্ত হয়। আব্বাসীয় বংশের খলিফাগনের জমকালো রাজপ্রাসাদ, বিলাস বহুল হেরেম, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার প্রভৃতি নির্মানে ব্যয়বহুলতা এবং খলিফাগনের অমিতব্যয়িতা তাঁদের সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করেছে। মুগল বংশের অধিকাংশ সম্রাটগনের অমিতব্যয়িতা ও ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি এবং শাহজাহানের তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ও অন্যান্য বহুবিধ-কীর্তি নির্মানের জন্যে রাজকোষের যে প্রতিকূল ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তাকি তাদের পতনের বীজ বপন করেনি? ফরাসী বিপ্লবের জন্যেও অনেকাংশে অর্থনৈতিক দুরাবস্থাই দায়ী। আবার রাশিয়ায় জার সাম্রাজ্য পতনেরও অন্যতম কারণ ছিল জন সাধারণের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা।

সিংহাসন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অভাব দেখা-যায়। ফলে যে গৃহ-বিবাদের সূচনা হয় তা সাম্রাজ্যের পতনের পথকে সুগম করে। এ কথা-গুলি বিশেষ করে ঐসলামিক সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশী করে প্রযোজ্য। উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয় বংশ, দিল্লী সালতানাত ও মুগল বংশের শক্তি হ্রাসের একটি প্রধান কারণ ছিলো শাসক নির্বাচনের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অভাব। ফলে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যের পতনকে ডেকে আনে।

সাম্রাজ্যের বিশালতাও সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। মুগল সাম্রাজ্যের বিশালতাও ইহার পতনের জন্যে অনেকাংশে দায়ী। আওরঙ্গজেবের সময় সাম্রাজ্য আফগানিস্তান হ'তে আসাম এবং কাশ্মীর হ'তে মহীশুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে যুগে দ্রুত যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং মুগল সাম্রাজ্যের বিশালতা ক্ষমতার উৎস না হয়ে দুর্বলতার কারণ হয়েছিল। উমাইয়া, আব্বাসীয়, রোমান সাম্রাজ্য এবং দিল্লী সালতানাতের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করলেই সাম্রাজ্যের বিশালতাকেও স্বীকার করতে হবে।

সাম্রাজ্য বিশাল হলেও বাবর, আকবর ও আওরঙ্গজেবের মত যোগ্য সম্রাটগন তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অধিকাংশ সম্রাটগনই অযোগ্য ও অকর্মন্য ছিলেন। পরবর্তী শাসকগণের দুর্বলতাও সাম্রাজ্যের একটা সাধারণ কারণ বলে অভিহিত করা যায়।

সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিভিন্নমুখী হ'তে পারে সত্যি কিন্তু যদি সাধারণ কারণগুলোর সংশোধনে কোন শাসক ব্রতী হতেন তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর পতন তত সহজতর হ'ত না। ইতিহাস যে সব সাম্রাজ্যের পতনের সাক্ষ্য বহন করে সেসব সাম্রাজ্যের শাসকগণ পতনের সাধারণ কারণগুলোকে সংশোধন করতে চেষ্টা না করে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা মহান শিক্ষা। এ শিক্ষা গ্রহন করলেই কেবল অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, অশান্তি, কলহ-বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে ন্যায়, সত্য, সাম্য, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের শিক্ষা কেউ গ্রহণ করতে চান না।

দুষ্ট ছেলে

শহীদুল ইসলাম
চতুর্থ শ্রেণী 'ক' শাখা
স্কুল নং-২২৩৭

করিম নামের একটি ছেলে
বেড়ায় শুধু পড়া ফেলে
বই আনতে বললে তাকে
খাটের নীচে লুকিয়ে থাকে,
হঠাৎ যদি ধরা পড়ে
ঘুমিয়ে থাকার ভানটি করে।

মনে মনে আছাড়

মোঃ সদরুল আমিন ভুঁইয়া
তৃতীয় শ্রেণী
স্কুল নং ২৩৮৭

মনে মনে বলি আমি
তাল গাছে চড়ে
এখন যদি পা পিছলে
হঠাৎ যাই পড়ে।
মা এসে বলবে তখন
করেছি আমি ভুল
বাবা রেগে আগুণ হয়ে
ছিড়েই দিবে চুল।
দরকার নেই পড়ে গিয়ে
এখন নেমে যাই,
জেনে শুনে বোকার মত
আছাড় কেন খাই।

ব্যাঙের সর্দি

মামুন খাঁন
সপ্তম শ্রেণী, 'খ' শাখা
স্কুল নং ১৬২২

ব্যাঙের যখন সর্দি হলো সাপের হলো রাগ,
উচ্চঃ স্বরে হুকুম দিল জাগরে সবাই জাগ॥
বনের যত কীট পতঙ্গ মধ্য রাতে জেগে,
সর্প রাজার হুকুম শুনে দৌড়ে এল বেগে।
পিপঁড়ে ছিল এম, বি, বি, এস, নতুন চিকিৎসক
ফোন করে সাপ জানায় তাকে বড়ই আবশ্যক।
তাগড়া জোয়ান ব্যাঙ ধরেছি ডিনার খাবার তরে,
এখন কিনা সর্দি লেগে যাচ্ছে ব্যাটা মরে।

শপথ

এ, কে, এম, মাহাবুব আলম চৌধুরী
নবম মানবিক
স্কুল নং-২১৪৬

পড়া লেখা শিখব মাগো বিদ্যালয়ে গিয়ে
গুরু ভক্তি করব মাগো আপন জীবন দিয়ে।
শিখব আমি অনেক কিছু লিখব কত বই
বাসবে আমায় ভাল সবে ভদ্র যদি হই।
ফুলের মতো হব মাগো গন্ধ নিবে সবে
নিজের হাতে করব গো দান, নাম ছড়াবে ভবে।
দেশের সেবা করব মাগো গড়ব নাকো গাড়ী
আমি হব দেশের রাজা থাকবে না মোর বাড়ী॥

মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

হিমাদ্রি শেখর সাহা
স্কুল নং-২০৬৮
দ্বাদশ বিজ্ঞান

সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে সকল মানুষ বর্বর অসভ্য ছিল; এ কথা সম্ভবত: কারো কাছে অবিদিত নয়, যুগের পরিক্রমায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গুহাশ্রয়ী মানব আজ সভ্যতার শিখরে। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমা ক্রমশ: বেড়েই চলছে। বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন নতুন নতুন Theory, Hypothesis ইত্যাদি। বিজ্ঞানের অলৌকিক আবিষ্কারে মানব জীবনের মান উন্নত হচ্ছে। কিন্তু সভ্যতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আজ বিষাক্ত। মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ইত্যাদি লেগেই আছে। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও মানব কল্যান বিঘ্নিত। একটু চিন্তা করে দেখুন বিজ্ঞান আজকে আমাদের যা দিচ্ছে সবই দৈহিক প্রয়োজনের নিমিত্ত অর্থাৎ Physical fitness. । বড় বড় Building তৈরি হয়েছে, Scientific cultivation-এ খাদ্যের Production অনেক বেড়ে যাচ্ছে। দ্রুত যানবাহনের ব্যবস্থা হয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সব কিছুই মানুষের দৈহিক প্রয়োজনে। একেই বিজ্ঞান বলে মানব কল্যান। যদি মানব কল্যানের জন্যই বিজ্ঞান এত করে থাকে তবে কেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অশান্তির বিষক্রিয়ায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তারক্তি, মারামারি, কাটাকাটি যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক সকল ক্ষেত্রেই আজ উদ্বেগ, অশান্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা। এ সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই? নিশ্চই আছে।

মানব জীবনের দু'টি অংশ--দেহ ও আত্মা একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের দেহের উন্নতির যেমন প্রয়োজন তেমনি আত্মার উন্নতির প্রয়োজন। ।এ দু'টো সমান হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান আমাদের শুধু দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়েছে; কিন্তু আত্মা ক্ষুধার্ত দেহের। খাদ্যই আমরা দিনরাত সন্ধান করি, আত্মার খাদ্যের কোন অনুসন্ধানই করি না, এই দেহ ও আত্মার অসাম্যই সকল অমঙ্গলের হেতু। মানুষের আত্মিক উন্নতি বিজ্ঞান দিতে পারে না। Laboratory-তে আত্মার উন্নতির জন্য Tablet তৈরী হয়-নি। তাই বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের মানবিকগুণের বিকাশ না হলে মানব কল্যান সম্ভব নয়।

এখন দেখা যাক মানুষের আত্মার উন্নতি কি ক'রে সম্ভব। আত্মা ও দেহের বৈষম্যেই জীবনের সাম্য নষ্ট হয়েছে। এই সাম্যতা নষ্ট হবার কারণ আত্মা ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্বে আমরা বড় একটা গুরুত্ব দিই না। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে আমরা খুব বেশী সচেতন নই। কিন্তু দেহের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি আত্মার প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার অর্থাৎ আমাদের অন্তরাত্মার

ভিতরে মহান পরমাত্মার কাছ থেকে অমৃত আস্বাদনের একটি সুপ্ত স্পৃহা আছে। সত্য, সুন্দর, মহৎ গুণাবলীর অনুশীলনের মাধ্যমেই সেই স্পৃহাকে তৃপ্ত করা যায়। সেই স্পৃহা তৃপ্ত হলেই মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে যার ফলে মানুষে মানুষে আর অসাম্য থাকে না। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ মানেই তো প্রকৃত মানুষ। এই মনুষ্যত্বই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। অগ্নির ধর্ম যেমন দহন, জলের ধর্ম যেমন তৃষ্ণা নিবারণ; তেমনি মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। আমরা আজ বিজ্ঞান শিখে যাচ্ছি; কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ হচ্ছে না। ফলে মানবকল্যান ব্যহত হচ্ছে। তাই আজ বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীদের মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন তাইতো জনৈক মনীষী বলেছেন—"Education is the complete development of the divinity that lies dormant in man।" শুধু শিক্ষায়তনেই নয় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই মানবিক গুণাবলীর বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। মনুষ্যত্ব একদিনে অর্জন করা যায় না। এর জন্য একটা Systematic way দরকার। মহাপুরুষরা যুগে যুগে সেই পথ প্রদর্শন করেছেন। সেই পথ অনুসরণ করলে মানুষের মধ্যে যে dormant divine spark রয়েছে তার বিস্ফোরণ হবে এবং সে একজন সত্যিকার মানুষ হয়ে মানব কল্যানে আত্ম নিয়োগ করবে--একথা অনস্বীকার্য এভাবে প্রতিটি মানুষ যদি দৈহিক উন্নতির সাথে সাথে আত্মার উন্নতির জন্য সদা তৎপর থাকে তবে মানুষে মানুষে আর ভেদাভেদ থাকবে না। এবং তখনই--সৃষ্টি হবে সর্বাঙ্গীন সুন্দর নূতন সমাজ।

ধর্মকে অস্বীকার ক'রে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা যাবে না। চৌর্যবৃত্তিকে বিজ্ঞানের Atom Bomb দ্বারা ধবংস করা যাবে না। Social evils ধবংস করার যন্ত্র বিজ্ঞানের কাছে নেই। তাই আজ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্যে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। প্রতিটি মানুষের যেদিন ঘুমন্ত মানবিক মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করবে সেদিন পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হ'বে সাম্য আর সাম্য সৃষ্টি হলেই পৃথিবীর সমস্ত কলুষ, অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসত্য ধবংস হয়ে যাবে। ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এক নতুন জগৎ।

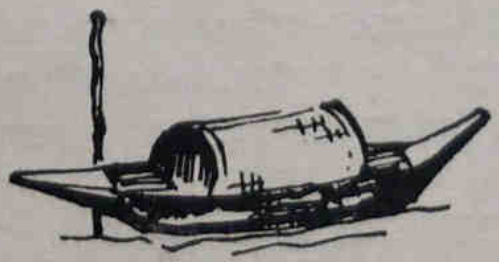

টঙ্গীর বিশ্ব এস্তেমা

ইফতেখার মাহ্‌মুদ
সপ্তম শ্রেণী

টঙ্গী শিল্প এলাকা সংলগ্ন প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের নীচে চলছে বিশ্ব এস্তেমা অর্থাৎ সারা বিশ্বের ধর্মপ্রান মুসলমানদের বাষিক সম্মেলন। এবারের এস্তেমায় অন্যূন পনের লক্ষাধিক মুসলমানের সমাবেশ ঘটেছে টঙ্গীতে।

কৌতূহলী মন নিয়ে আমিও অংশ নিয়েছিলাম। এখানে যাঁরা ভাষণ দান করেন তাঁদের মূল বক্তব্য—আল্লাহর হুকুম আহকাম মত এবং রসুলে করিম (দঃ)-এর অনুকরনে জীবন গড়ার জন্য বিশ্ববাসীকে আহবান। আশ্চর্যের বিষয় এরা কেউই রাজনীতি চর্চা অথবা অমুসলমানদের কটাক্ষ করে কোন কথাই বলেন না। শুধু কালেমা ঈমানের দাওয়াত দেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে মুনাজাত করে আস্তে আস্তে বাইরে আসার চেষ্টা করছি। পিছন থেকে ফজল চাচা আমাকে দেখে অতিকষ্টে কাছে এসে বললেন, অবসর মত তার বাড়ীতে জরুরী কাজে একবার দেখা করতে।

আমিত অবাক। এই ফজল চাচা গ্রামে পরের জমি দখল, সালিশীতে পক্ষপাতিত্ব, রাস্তার টাকার মিথ্যা ভাউচার দাখিল ইত্যাদি অপকর্মের জন্য আমরা তাকে ঘৃণা করেছি। গ্রামের দুষ্টগ্রহ হওয়া সত্বেও তার সামনে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি। ১৯৬৯ সনে বাঙালীর দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিনা করেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবাঙালীদের মালপত্রলুট-পাট করতেও কসুর করেননি।

১৯৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে এই ফজল চাচাই রাজাকারের কমাণ্ডার হয়ে যথারীতি কাজ করেছেন। আবার ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের বিরাট পতাকা হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের আলিঙ্গন করে পাক সেনাদেরে শ্রাদ্ধ করেছেন।

ফজল চাচার বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে একটা তালিকা দেখিয়ে বললেন,—"তোমাদের পঁচিশ হাজার টাকা কিস্তিতে আমি দেব"—আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম—কিসের টাকা চাচা?—তিনি জানালেন সুদীর্ঘ দিন আমাদের একখণ্ড জমি জবর দখল করে ভোগ করেছেন সেই বাবদ প্রাপ্য এই টাকা। কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করলাম, তবে জমিটার কি হবে? তিনি বললেন আমাদের এবারই ফেরত দিবেন। সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করলাম—অন্যদের উপর যে জুলুম করেছেন তার কি হবে?—তিনি চোখের পানি ফেলে বললেন—পরের হক নষ্ট করলে আল্লাহ মাফ করবেন না তাই মরনের আগে সকলের দেনা শোধ করতে চাই।

এতক্ষণে বুঝলাম, ফজল চাচার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে টঙ্গীর বিশ্ব এস্তেমা থেকে।

মহাশূন্যের পথে

সালাউদ্দীন আহমদ
একাদশ, বিজ্ঞান
স্কুল নং ১২৭৭

মহাকাশ দেখে মানুষের মনে জাগে জয় করার তীব্রআকাংখা---যার ফলশ্রুতি মহাশূন্য অভিযান। তাই চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহে গ্রহে ভ্রমন মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বলা যেতে পারে এবং এই মহাকাশ ভ্রমন তখন থেকেই সহজতর হতে চলেছে, যখন টেলিস্কোপ আবিস্কার হল আর নিউটনের সূত্র সমূহ বাস্তবায়িত হল।

মানুষ মহাকাশের এই অসীম পথকে অতিক্রম করার উপায় আবিস্কারে মনোনিবেশ করল। তখনই রকেটের আবিস্কার হল, যার গতি সকল যানের চেয়ে দ্রুততর। পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে অতিক্রম করতে হলে সেকেণ্ডে ৭ মাইল গতিবেগ অর্জন করা দরকার এবং তা পেরেছে শুধু রকেটই। যার গতিবেগ ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশী।

১৯৫৭-১৯৫৮ সালের মধ্যে আমেরিকা পৃথিবীর কক্ষপথে ৫টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করে। এবং রাশিয়া নিক্ষেপ করে ৩টি। তার মধ্যে রাশিয়ার স্পুটনিক-৩-এর ওজন ছিল ২৯২৫ পাউণ্ড। ১৯৫৯ সালে রাশিয়া একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করে এবং উহা চাঁদের অনেক অদেখা অংশের ছবি তুলে ১১দিন পরে পৃথিবীতে পাঠায়। ১৯৫৯ সালে আমেরিকা আরও ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করে। ১৯৬০ সালে রাশিয়া ৯৯৪৪ পাঃ-এর একটি মহাশূন্যযান পৃথিবীর কক্ষপথে নিক্ষেপ করে, যার ভিতর ছিল একটি চাপ নিয়ন্ত্রিত মানুষের দেহের আকৃতি বিশিষ্ট একটি কেবিন।

ঠিক তার পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৯৬১ সালে রাশিয়া প্রথম মানুষবাহী মহাশূন্যযান নিক্ষেপ করে এবং সেই মহাশূন্য যানে চড়ে মেজর এ, গ্যাগারিন পৃথিবী প্রদক্ষিন করে সুস্থ শরীরে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

এর পর রাশিয়া মানুষ বিহীন মহাশূন্যযান চাঁদে পাঠায়, এবং সেখান থেকে সরাসরি ছবি সংগ্রহ করে।

১৯৬৯ সালে মহাশূন্য অভিযানের সফল ও উত্তেজিত বৎসর। ঐ বছরের ২০শে জুলাই মহাশূন্য অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়। কারণ ১৬ই জুলাই ৩ জন অভিযাত্রী নিয়ে "এ্যাপোলো ১১" মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তারা চাঁদমামার দেশে যাত্রা শুরু করে এবং অবশেষে ২০শে জুলাই তারা চাঁদের বুকে যুগান্তর ব্যাপী প্রত্যাশিত মানুষের পদচিহ্ন এঁকে দেয়।

এরপর ১৯৭৬ সালে "ভাইকিং ১"এবং "ভাইকিং২" মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে এবং সেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করে। দেখা যাচ্ছে, এক মাত্র রকেটই মানুষের কল্পনাকে

বাস্তবে রূপায়িত করতে চলেছে। তাই আমাদের রকেট এবং তার বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

রকেট

সব রকেটেই জ্বালানী জ্বলে, ফলে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এবং গ্যাস পিছনের দিকে নির্গমনের ফলে পিছনের দিকে যে ধাক্কা দেয় তার ফলেই রকেট সামনের দিকে চলে ; রকেটের এই গমন নিউটনের সূত্র অনুসারে হয়ে থাকে। এই সূত্র অনুসারেই আমরা জানি প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

সাধারণত এরোপ্লেন জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। এবং উহা চলার সময় বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। ফলে জেট ইঞ্জিন বায়ু ছাড়া চলতে পারেনা কিন্তু রকেট ইঞ্জিন বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে না। ফলে ইহা বায়ুমণ্ডলের বাইরেও চলতে পারে। রকেটের জ্বালানী জ্বলার জন্য যেটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তার সবটুকুই রকেটের ভিতর থাকে। এখানেই জেট-ইঞ্জিন ও রকেটের মধ্যে পার্থক্য। এই জন্য এরোপ্লেন বায়ু মণ্ডলের বাইরে চলতে পারে না। কিন্তু রকেট বায়ুমণ্ডলের বাইরে অনায়াশে চলতে পারে।

রকেটের প্রকার ভেদ ঃ

১। কঠিন জ্বালানী রকেট।

২। তরল জ্বালানী রকেট।

(১) কঠিন জ্বালানী রকেট ঃ--- ইহার দুটি প্রধান অংশ থাকে। একটি জ্বালানী কক্ষ যেখানে জ্বালানী জ্বলে এবং একটি জেটের আকারে জলন্ত গ্যাস জ্বালানী কক্ষ থেকে বের হয়। জ্বালানী গুলি রাবার, Resin অথবা Asphalt মিশ্রণ। অন্যগুলি নাইট্রসেলোলেজ এবং নাইট্রগ্লিসারিনের মিশ্রণ।

(২) তরল জ্বালানী রকেট ঃ---অনেক উচ্চতায় গমনকারী রকেটের বেশীর ভাগই "তরল জ্বালানী রকেট"। এই প্রকার ইঞ্জিনে একটি জ্বালানী কক্ষ থাকে এবং একটি ইনজেক্টর যা জ্বালানী দ্রব্য জ্বালানী কক্ষে নিয়ে আসে। একটি নির্গমন নল ও নির্গমন নলের চারিদিকে একটি ফাপা জ্যাকেট থাকে। জ্বালানী একটি পাম্পের সাহায্যে চাপের ফলে জ্বালানী কক্ষে প্রবেশ করে। কঠিন জ্বালানী রকেটে জ্বলন কাল খুবই কম। এবং নির্গম নলের ধাতু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গলে যেতে পারে। কিন্তু "তরল জ্বালানী রকেটের" নির্গম নল শীতল করার ব্যবস্থা রয়েছে। শীতল করার সবচেয়ে সোজা পদ্ধতি হচ্ছে তরল জ্বালানী, জ্বালানী কক্ষে প্রবেশ করার আগে নির্গম নলের চারিদিকের জ্যাকেটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা।

এই জাতীয় রকেট সাধারণত দুই ধরণের তরল পদার্থ বহন করে থাকে। এই তরল পদার্থ দুটি ; দুটি আলাদা পাত্রে বা Tank-এ থাকে। তার মধ্যে একটি পদার্থ হচ্ছে অক্সিডাইজার, যাহা অক্সিজেন বহন করে এক কথায় ইহা তরল অক্সিজেন। ইহা জ্বালানীগুলিকে জ্বলতে সাহায্য করে। অথবা ইহা নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ও হতে পারে। অন্য তরল

পদার্থটি এলকহলও হতে পারে। তরল অক্সিজেন রকেটের জন্য অথবা নাইট্রিক এসিড রকেটের জন্য Aniline-ও হতে পারে।

যখন এই দুইটি তরল পদার্থকে জ্বালানী কক্ষে প্রবেশ করানো হয়, তখন কোন কোন তরল জ্বালানী সাথে সাথেই জ্বলতে শুরু করে।

কিন্তু বেশীর ভাগ তরলেই অগ্নি সংযোগ করিয়ে নিতে হয়। সাধারণতঃ Slow burning gun powder, নির্গম নলের ভিতর চার্জ দিয়ে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

জ্বালানী জ্বলার সাথে সাথেই সেখানে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় এবং জ্বালানীর গ্যাস প্রচণ্ড বেগে নির্গম নল দিয়ে বের হয়ে আসে। এবং নিউটনের ৩য় সূত্র অনুযায়ী যে বলে গ্যাসের অণুগুলি বের হয়ে আসে ঠিক সম পরিমান বেগেই বল রকেটের উপর বিপরীত দিকে কাজ করে; ফলে রকেট ছুটতে থাকে।

এই প্রকার রকেট অতি সাধারণ, এবং খুবই সহজ প্রণালীর।

বহু ধাপ বিশিষ্ট রকেট (Multistage Rocket) ঃ

বড় বড় রকেটগুলি সাধারণতঃ বহু ধাপ বিশিষ্ট হয়ে থাকে কারণ এর ফলে বেশী ওজনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মানুষ মহাশূন্যে পাঠানো যায়।

প্রত্যেকটি ধাপই একটি সম্পূর্ণ রকেট। এবং সব ধাপগুলি একসাথে জ্বলে না। প্রথম ধাপ প্রথমে জ্বালানো হয়। এই ধাপটিকে বুসটার রকেটও বলে (Boster Rocket), এর জ্বালানী পুড়ে গেলে প্রথম ধাপটিকে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এবং ফলে অপ্রয়োজনীয় ওজন কমে যায় এবং ওজন কমার ফলে গতিবেগ আরও বেড়ে যায়।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে কোন রকেটকে যেতে হলে তার ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৭ মাইল গতিবেগের প্রয়োজন হয়। এক ধাপ বিশিষ্ট রকেটের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই জন্যই বহুধাপের রকেটের প্রয়োজন। চাঁদে যাওয়ার জন্য সাধারণত তিন ধাপের রকেট ব্যবহার করা হয়।

যে সমস্ত রকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করা হয় ঃ

এই সমস্ত রকেটে কৃত্রিম উপগ্রহটি রকেটের উপরের অংশে থাকে। রকেটটিকে পৃথিবীর চারিদিকের নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিক্ষেপ করা হয় এবং কৃত্রিম উপগ্রহটিকে রকেট থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

চাঁদে পাঠাবার রকেট ঃ

এই রকেটটিকে নিক্ষেপ করার পর উহা প্রথমে সোজাসুজি উপরের দিকে উঠে যায় এবং কিছু পরে উহা পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকে এবং তখনই ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়। আবার ইঞ্জিন চালানোর ফলে উহা পৃথিবীর কক্ষ পথ থেকে বের হয়ে আসে এবং চাঁদের দিকে যায়। চাঁদের কাছাকাছি আসলে রকেটটিকে উল্টো করে চালু করা হয়

ফলে উহার গতিবেগ কমে যায়। তখন উহা তাদের কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। তখন লুনার মডিউল চাঁদে নামে। কাজ শেষে উহা আবার রকেটে ফিরে আসে। তখন রকেটের ইঞ্জিন চালু করে গতি আবার বাড়ান হয়। ফলে রকেট চাঁদের কক্ষপথ ত্যাগ করে আবার পৃথিবীর দিকে প্রত্যাগমন করে। আবার পৃথিবীর কাছে আসলে রকেটটিকে পৃথিবীর দিকে মুখ করে চালান হয় ফলে গতিবেগ কমে যায়। এবং প্যারাস্যুট দিয়ে কমাণ্ড মডিউলকে পৃথিবীতে নামানো হয়।

কিন্তু রকেটের প্রত্যেক ধাপ খশে যাবার পর উহা আবার মাটিতে পড়ে না। এর কারণ হচ্ছে অবশিষ্টাংশগুলি কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরতে থাকে। এবং যদি দু'একটি বায়ুমণ্ডলে আসে সেগুলি বায়ুর সাথে ঘর্ষনের ফলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অতএব এগুলি মাথায় পড়ার ভয় নাই।

আগামী দিনের রকেট ঃ

১। আণবিক রকেট
২। বৈদ্যুতিক রকেট

১। আণবিক রকেট ঃ--- আণবিক রকেটে জ্বালানীকে উত্তপ্ত করা হয়, ফলে প্রচুর পরিমাণ গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এবং যখন এই পদ্ধতি কাজে খাটানো যাবে তখন সাধারণ রকেটের চেয়ে ইহা বহুগুণ শক্তিশালী হবে।

২। বৈদ্যুতিক রকেট ঃ--- ইহা উত্তপ্ত গ্যাসের জেটের পরিবর্তে চার্জিত কণার উপর নির্ভরশীল। এই কণাগুলি আয়ন অথবা ইলেকট্রন। এইগুলি ইলেকট্রিক অথবা মেগনেটিক ফিল্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বৈদ্যুতিক রকেটে অল্প বল প্রয়োগের ফলে বিপুল শক্তি পাওয়া যায়। এবং ইহা এক সঙ্গে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনকি মাসের পর মাসও কাজ করতে পারে।

নিঃসন্দেহে এমন রকেট মহাশূন্য অভিযানে যুগান্তর সৃষ্টি করবে। আসুন আমরা সেই শুভদিনের জন্য কাজ করে যাই।

এরা সর্বহারা

এস. এস. আলম
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান

দুয়ারে দাঁড়ায়ে দেখো
শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে আছে কারা,
ভাই-বোন নয় এরা,
এরা সর্ব হারা॥

এদের বুকের ব্যর্থ হাহাকার;
শক্তি দেবতার নিষ্ঠুর পেষণে তা
হয়েছে অস্বীকার।

পারে নি পার হতে তারা
জীবনের সংগ্রামী পারা,
এরা সর্বহারা॥

নিয়তির ধ্বংস লীলা আর
বজ্রের হুংকার শুনে
কাঁপিছে এদের প্রান;
রিক্ততার তাড়নায় আর
ব্যর্থতার নির্মম টানে,
ভুগিছে এদের শান॥

অবহেলা, ঘৃণা, ঘাত পদাঘাত সয়ে
কেটে যায় এদের জীবন দুঃসহ হয়ে
ছেড়ে যায় নীরবে এ নিষ্ঠুর ধরা,
এরা সর্ব হারা॥

কেঁচো

মোঃ শাহ আলম
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান
স্কুল নং ২১৩৯

একটি ক্ষুদ্র প্রাণী কিভাবে মানুষের বৃহত্তর কল্যানে আসতে পারে, তার উজ্জল প্রমান কেঁচো। কথাটা শুনে নাক উল্টালেও---এটাই আদিম এবং অকৃত্রিম সত্য।

কেঁচোর সবকিছুই অদ্ভূত। এই ভারী অদ্ভূত প্রাণীটি আমাদের কি উপকারে আসে জান? এক কথায় বললে বলতে হয়---মাটিকে নরম করে, অদ্রবণীয় পদার্থকে দ্রবণীয় করে, কিন্তু কি ভাবে? প্রশ্নটা স্বাভাবিক। বলছি শোনো। কেঁচোর খাদ্য হল মাটির সাথে মেশান গলিত জৈব পদার্থ। এই খাদ্য যখন কেঁচো গ্রহণ করে, সেই সাথে অনেক মাটিও সে খেয়ে ফেলে। এই মাটি সে আর হজম করতে পারেনা। অন্যান্য বর্জ্যদ্রব্যের সাথে বৃক্ক ছিদ্র দিয়ে বের করে দেয়। ফলে শক্ত মাটি নরম হয়ে যায়। মাটিতে যে সব অদ্রবণীয় খনিজ পদার্থ থাকে, কেঁচোর পাকে রসের সংস্পর্শে তাদের অনেক গুলো পরিবর্তিত হয়ে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়। ফলে উদ্ভিদ সহজেই তা গ্রহণ করে পারে। তা ছাড়া কেঁচো যখন গর্ত করে তখন অনেক মাটি সে গিলে ফেলে। কেঁচোর দাঁত না থাকায় এই মাটি সে চিবোতে পারেনা। এই খেয়ে ফেলা মাটি সে কুণ্ডলীকারে বাইরে নিক্ষেপ করে। এই ভাবে কেঁচো যতই নীচে যায়, ততই নীচের মাটি উপরে উঠে আসে। ফলে,

১। মাটি নরম হয়।
২। জমির আর্দ্রতা বাড়ে।
৩। জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমান বাড়ে।
৪। বাতাস চলাচলের সুবিধা হয়।

কিন্তু আশ্চর্য কি জান? কেঁচো অন্ধ-বধির হাদপিণ্ডহীন। তার ত্বক খুব সংবেদনশীল। কেননা তার ত্বক অনেক স্নায়ুকোষে ভরা। ত্বকে সিটি নামে যে ছোট কাঁটা থাকে তা কেঁচোর অনুভবে সাহায্য করে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে কেঁচোর শরীর গোল গোল ১০০/১৫০-টি অংগুরীর মত অংশে বিভক্ত। এগুলোর এক একটির নাম সিগমেন্ট। প্রতিটি সিগমেন্টে চারজোড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

চুন থাকে। এদের সাহায্যেই সে চলাফেরা করে। কেঁচোর দেহ গোল ঠিকই, তবে এর বুক ও পিঠও আছে। বুকে ভর দিয়েই সে ঘুরে বেড়ায়। কেঁচোর মুখ সূচাল ও পিছন দিকটা ভোঁতা।

বস্তুতঃ কেঁচো এনেলিজ পর্বীয় প্রাণী। আমাদের দেশে সচরাচর আমরা যে সব কেঁচো দেখে থাকি, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম ফেরেটিমা পসথুউমা।

যদি কখনো তুমি একটা কেঁচো ধর, দেখবে কেঁচোর ত্বক বেশ ভেজা আর আর্দ্র। কেন জান? কেঁচোর কোন ফুসফুস নেই। এই ত্বক দিয়েই সে শ্বাসকার্য চালায় সহজেই অনুমেয় ভেজা ত্বক ছাড়া এ কাজ হয়না। তাই কেঁচো তার পিঠের ১২শ সিগমেন্ট থেকে শেষ সিগমেন্ট পর্যন্ত প্রতি দুই সিগমেন্টের অন্তবর্তী রেখার পৃষ্ঠ ছিদ্র দিয়ে বিভিন্ন রকম রস বের করে ত্বককে সবসময় ভেজা রাখে। এবার নিশ্চয় বলতে পারবে—কেঁচো সাধারণত: স্যাত স্যাতে জায়গায় থাকে কেন? এজন্যই তুমি বর্ষাকালে বা আর্দ্র দিনে যত কেঁচো দেখবে শীতকালে তার অর্ধেকও দেখবেনা।

কেঁচোর ত্বকের মধ্যে পরিষ্কার পাটল বর্ণের একটা সরু দাগ দেখা যায়। এটাই কেঁচোর রক্তবাহী নালী। কেঁচোর পৃথক কোনো হৃদপিণ্ড নেই। উপরোক্ত রক্তবাহী নালীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই রক্ত চলাচল করতে পারে। কেঁচোর রক্ত রসে লোহিত কণিকা নেই, তবে কিছু শ্বেত কণিকা আছে। রক্তরঞ্জকের উপস্থিতির জন্যই কেঁচোর রক্ত লাল। একটা জিনিষ—কেঁচোর শরীরের কিন্তু ৭ম, ৯ম, ১২শ এবং ১৩শ অংশের রক্তবাহী নালী কিছুটা স্ফীত। আর এই স্ফীত অংশই হৃদপিণ্ডের কাজ করে।

কেঁচোর শরীরে ১৪শ ১৫শ ও ১৬শ সিগমেন্ট ত্রয় মিলে চওড়া ফিতার আকৃতি নিয়েছে। এদের বলে ক্লাইটেলাম। ক্লাইটেলামে কোন চুল থাকে না। এখানেই স্ত্রী জননতন্ত্র অবস্থিত। আর ১৮শ সিগমেন্টে রয়েছে পুরুষ জননতন্ত্র।

কেঁচোর সমস্ত দেহ স্বচ্ছ সবন্ত্র কৃত্তিক দিয়ে আবৃত। কেঁচোর আত্মরক্ষা কিন্তু এর সাহায্যেই হয়ে থাকে।

যদি কখনো কেঁচোর পিঠের দিকে লক্ষ্য কর দেখবে একটা কালচে দাগ। এর শেষাংশ আবার হলদে। এটাই কেঁচোর পরিপাক নালী। পরিপাক নালী মুখ থেকে মলদ্বার পর্যন্ত প্রলম্বিত। এটার মুখ সরল, সরু লম্বা। পরিপাক নালী প্রধানত: প্রোস্টেমিয়াম, মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালী, গিজার্ড, অন্ত্র, ট্রিপলোসোল ও মলনালী এই কয়টি অংশে বিভক্ত।

আগেই বলেছি—কেঁচো খুব অনুভূতিশীল প্রাণী। অন্যের উপস্থিতি সে সহজেই টের পায় বুঝতেই পারছ এর স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে। হ্যা ঠিকই। কেঁচোর স্নায়ুতন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও প্রান্তস্থ: স্নায়ুতন্ত্র।

কেঁচো নাইট্রোজেন যুক্ত দ্রব্য নিষ্কাশিত করে বলেই মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। এবার আসি রেচনতন্ত্রের কথায়। কেঁচোর রেচন যন্ত্র কুণ্ডলীকার। নাম হচ্ছে নেফ্রেডিয়া। কেঁচো উভলিংগ প্রাণী।

একটা মজার কথা কি জান---৫০ হাজার কেঁচো বছরে প্রায় ২৭০ মণ মাটি খেতে পারে। আমাদের দেশে মাটির গর্তে এক একরেই ৫০ হাজার কেঁচো আছে। সুতরাং ভেবে দেখ—কেঁচো আমাদের দেশে কেমন উপকার করছে।

আসলে কেঁচোর জীবন যাত্রা ভারী কৌতূহলজনক। এই ছোট প্রাণীর জীবন বৈচিত্র্য অফুরন্ত। তোমরা ইচ্ছে করলে এ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে। শুধু কেঁচো কেন আরো অনেক প্রাণী আছে---তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা কর, দেখবে রোমাঞ্চকর রহস্যের মাঝে তুমি হারিয়ে গেছ।

আর্শি

সুফি মোঃ শোয়েব
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান
স্কুল নং ২০৯৪

আর্শি তুমি দেখাও আমায়
প্রাণটি আমার জীবন ছায়ায়
জীবন সেটি পদ্ম পাতায়
কম্প নীচের প্রায়।

আর্শি তুমি প্রতিফলন,
কর আমার জীবন মরণ
জীবন সেটি করছে স্মরণ
অকুল কূলে হায়।

আর্শি তুমি দোলাও আজি
আমার পাপ পুণ্য রাজি
পাপ সেটি আজ আছে সাজি
জীবন অলংকারে।

আর্শি দেখাও আমার মাঝে
বর্ণচোরা জীবনটাকে
বর্ণ বদল করছে সাঁঝে
অন্ধ অহংকারে।

আর্শি তুমি আঁধার রাতে
চমকে উঠ আমার সাথে
পংক মাখা জীবনটাতে
দিয়ে দৃষ্টি রেখা।

ওরে আমার মন-আরশি
আপন মনে আপনি চষি
আপনাতেই পড় উছসি
আপন-জীবন-লেখা।

সেই হবে তোর রাতের শশী.
দৃষ্টি যাবে পড়বে খসি
ওরে আমার প্রান-আরশি
আপন হৃদয় পানে।

যেমনি ঘুচে রাতের আঁধার
চন্দ্র যাবে নিশার মাঝার,
প্রানের প্রতীক আর্শি আমার
আলোর আঁখি হানে।

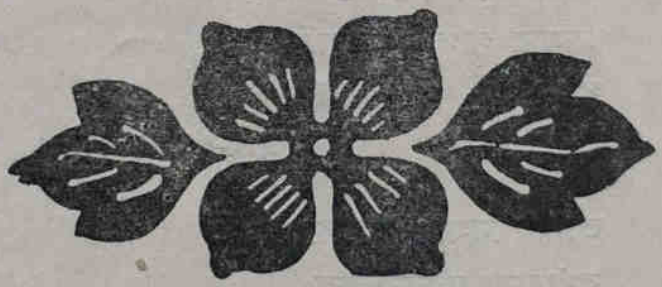

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
"যেমন খুশী তেমন সাজে"

বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

বার্ষিক চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীতে সমাগত দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে
আমাদের অধ্যক্ষ।

চারু ও কারু শিক্ষা

নূর মোহাম্মদ
অষ্টম শ্রেণী, 'খ' শাখা
স্কুল নং ১০৪৬

মানব সভ্যতার শুরুতে যেদিন মানুষ প্রথম বুঝতে পারল যে, তার আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন আনুষঙ্গিক কিছু জিনিস-পত্রের, সেদিন থেকেই প্রকৃত পক্ষে শুরু হয় চারু ও কারু শিল্পের পরিচর্যা।

জীবন রক্ষার তাগিদে আদি মানব প্রথম তৈরী করল পাথরের সাহায্যে এবড়ো থেবড়ো হাতিয়ার। বেশীদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারল না সেই ভোঁতা হাতিয়ার নিয়ে। কারণ ক্রমেই তার মধ্যে সৌন্দর্য চেতনা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন বৃদ্ধি পায়। এবড়ো থেবড়ো ভোঁতা হাতিয়ার রূপ নিল চোখা তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রে। আর সেই সঙ্গে পাহাড়ের গুহা ছেড়ে গড়তে লাগল কাঠ-খড় দিয়ে ঘর-বাড়ী। সভ্যতার ক্রমবিবর্তন বয়ে চলতে চলতে এমন এক সময় এল যখন মানুষ পাথরের অস্ত্রের পরিবর্তে ধাতুর অস্ত্র তৈরী করল, আর কাঠ-খড়ের ঘড়ের পাশে গড়ে উঠল ইট পাথরের অট্টালিকা। মানব সভ্যতার এই যে ক্রম-বিবর্তন এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই---মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। সেটি হল সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষন আর নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগ্রহ। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের এই আকর্ষন প্রাকৃতিক। সৌন্দর্যানুভূতি নিয়েই সব মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সব মানুষের পক্ষে প্রকৃতি দত্ত সেই অনুভূতিকে প্রসার লাভ করার সুযোগ মেলে না। যাদের মেলে তারা পরিচিত হয় জন সমক্ষে, আর যারা পারেনা তাদের সেই প্রকৃতির দান চিরদিন সুপ্তই থেকে যায়।

মানুষের এই যে আদি প্রবৃত্তি এর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বর্তমান সভ্যতা খুবই সচেতন আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে দেশে বিদেশে বহু শিল্প চর্চা কেন্দ্র। প্রকৃতির এই দান, আজ আমরা যারা কিশোর তাদের মধ্যেও আছে। আমরা যাতে আমাদের এই প্রকৃতির দানকে সুষ্ঠু ভাবে বিকাশ সাধন করতে পারি, তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই আদর্শ বিদ্যানিকেতনেও আছে শিল্প চর্চার সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

সৌন্দর্য সাধনা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে সুচারু রূপে পরিচর্যা না করলে তার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন ঘটেনা। এই পরিচর্যা শুরু করার উৎকৃষ্ট সময় হল শৈশব কাল। যে সকল শিশু জন্মের পর তার আদি প্রবৃত্তিগুলি বিকাশের সুষ্ঠু পরিবেশে পায় তারা সহজেই সেগুলির বিকাশ সাধন করতে পারে। দেখা যায় যে পরিবারে ছবি আঁকা বা সঙ্গীত চর্চা হয়, সে পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণত ঐ সকল বিষয়ের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শীও হয়ে ওঠে।

উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করেই বোধ হয় এই বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ এখানে শিল্প চর্চা তথা শিশু মনের সাবিক বিকাশ সাধন ও তাদের সৃজনী শক্তির প্রশার লাভের যথাযথ

ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। দুইজন পারদর্শী শিক্ষকের সযত্ন পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে চারু ও কারু বিভাগ। পাঠ্যক্রমে চারু ও কারুকলা প্রথম হতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক। এর পরবর্তী পর্যায়ে এটা বাধ্যতামূলক নয়। আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপে প্রতিনিয়ত চারু ও কারু শিল্পের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, প্রতি সপ্তাহে আমাদের ছাত্রাবাসগুলোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দিবসে ছাত্রাবাসের প্রতিটি কক্ষ, খাবার ঘর, মিলনায়তন প্রভৃতি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার পর আমাদের নিজেদের অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে দেয়ালগুলো না সাজালে কিছু কাজ যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই যে আমরা ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর দেয়ালে ছবি লাগাই, টেবিল বা লকারে দুই চারটি হাতের কাজ সাজিয়ে রাখি এর ভিতর দিয়ে আমরা একটা বিরাট শিক্ষা লাভ করে থাকি। সেই শিক্ষাটি হল রুচিবোধের। কোথায় কি ধরণের ছবি লাগালে, টেবিলে বা লকারে কোন ধরণের হাতের কাজ রাখলে সুরুচির পরিচয় মেলে তা আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই। সুপরিবেশে থেকে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত অনেক অর্থশালী ব্যক্তির বাড়ীতে গেলে তাদের আচার-আচরণ, বাড়ী-ঘড়, সাজ-সজ্জায়, মনের ও রুচির দীনতা সহজেই চোখে পড়ে। আমাদের এই কথাগুলি আজ নতুন মনে না হতে পারে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতি যে অনীহার ভাব লক্ষ্য করা যায়, তা চিন্তার বিষয় মনে করি।

আমাদের বিদ্যালয়ে আরও কতগুলি দিক আছে যেখানে আমরা আমাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির প্রশার লাভের সুযোগ পাই। যেমন ছাত্রাবাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সকল অনুষ্ঠান আন্তঃছাত্রাবাস প্রতিযোগিতামূলক। এই সকল অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জা থেকে শুরু করে মিলনায়তন ও ছাত্রাবাসের সকল সাজ-সজ্জা ছাত্রদেরকেই স্বহস্তে করতে হয়। তাতে করে আমরা ব্যবহারিক জীবনের অনেক কিছুই শেখার সুযোগ পাই। শিল্পাঙ্গনে মঞ্চসজ্জার একটি বিশেষ স্থান আছে। বিচিত্রানুষ্ঠান বা নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে যে কারিগরী জ্ঞান বা শিল্প নৈপুন্যের প্রয়োজন এখান থেকে সে বিষয়ে আমরা একটা মোটা-মুটি জ্ঞান লাভ করে থাকি। এটা যে আমাদের ভবিষ্যত কর্মময় জীবনে বিশেষ সাহায্য করবে এ বিষয়ে আমরা স্থির নিশ্চিত। এছাড়া আছে আমাদের বাৎসরিক অভিভাবক দিবস। এই দিবসটি আমাদের নিকট পরম আকাঙ্খিত। আমাদের সারা বৎসরের সমস্ত সাধনার একটি দিন। এই দিনে অভিভাবকবৃন্দ ও বহু সম্মানিত অতিথি সমাগত হন এই বিদ্যানিকেতনে। আর তাদের সামনে হিসাব-নিকাশ হয় আমাদের সারা বৎসরের অর্জিত প্রতিভার। এই দিনে সমস্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটিকে সুন্দর করে সাজানোর দায়িত্ব পড়ে আমাদেরই উপর। অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদেরকে চারু ও কারু শিল্পে নিয়োজিত শিক্ষক-বৃন্দ প্রয়োজনীয় ধ্যান-ধারণা ও নির্দেশ দিয়ে সর্ব প্রকার সাহায্য করে থাকেন। অভিভাবক দিবসকে উপলক্ষ্য করে বিদ্যা-লয়ের প্রবেশ পথে স্বাগত তোরণ, অনুষ্ঠান মঞ্চের প্রবেশ পথে আরও একটি স্বাগত তোরণ আমাদের শিল্প কর্মের দুইটি নিদর্শন। আমাদের আরও একটি আকর্ষনীয় অনুষ্ঠান হল বাৎসরিক চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী। প্রতি বৎসর আমাদের বিদ্যালয়ে সারা বৎসরের অঙ্কিত চিত্রকলা এবং হস্ত শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়ে থাকে। আমাদের অভিভাবকবৃন্দ ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন। এই প্রদর্শনীতে ছাত্রদের অঙ্কিত চিত্র ও হস্ত শিল্প বিশেষ প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ বহুবার পুরস্কৃত হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯৭৪

সালে আমাদের স্কুলের ছাত্র নসরুল হামীদ, ভারতীয় শঙ্কর আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে স্কুলের বিশেষ গৌরব অর্জন করেছে।

আমাদের বিদ্যায়তনে সঙ্গীত শিক্ষারও সুযোগ আছে। একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এখানে সঙ্গীতের শিক্ষাদান হয়ে থাকে।

শিশুমনের কোমল বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করার জন্য, সৃজনী শক্তির সুপ্ত প্রতিভাকে সুচারু রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদার মনোভাবের জন্য আমরা, এই বিদ্যায়তনের ছাত্রবৃন্দ গর্বিত। এই সকল দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার যেন আমরা করতে পারি, সকল ছাত্র ভাইদের নিকট এটাই আমার অনুরোধ।

অবসান

মোঃ ফেরদৌস আলম
দ্বাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান
স্কুল নং ৭৪১

আমরা ছোট বলেই
তোমরা এতো বড়,
আমরা ঘৃণ্য বলেই
তোমরা পূজনীয়
আমরা কুৎসিত বলেই
তোমরা সুন্দর,
আমরা পাপী, পবিত্র
তাই তোমাদের অন্তর।

মোদের উপর টেক্কা মেরে
উঠে যাও উপরে,
ভাবোনা তবু মোরা বিনা
উঠিতে কি উপায়ে,
মোদের উপর শোষণ
চালাও, বলেই ধনী তোমরা,
আমাদেরও সমান দাবী
সেটা কেন বোঝনা?
ছোট বলে কখনো
ঘৃণা যেন কোরোনা,
একদিন মোরা উঠবোই জেগে
মোদেরে হেলা কোরোনা,
সেদিন সুযোগ পেলে, তোমাদের
টুটি চেপে ধরবো,
নিয়ে আসবো তোমাদেরে
আমাদেরই সমানে।

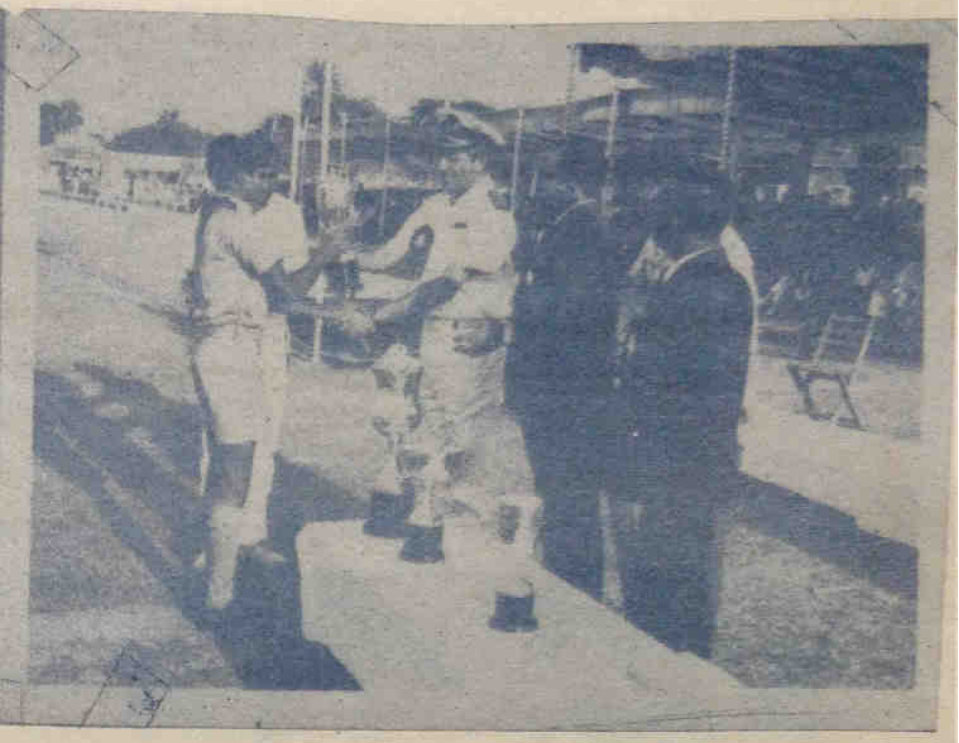

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি
রিয়ার এডমিরাল এম, এইচ খান।

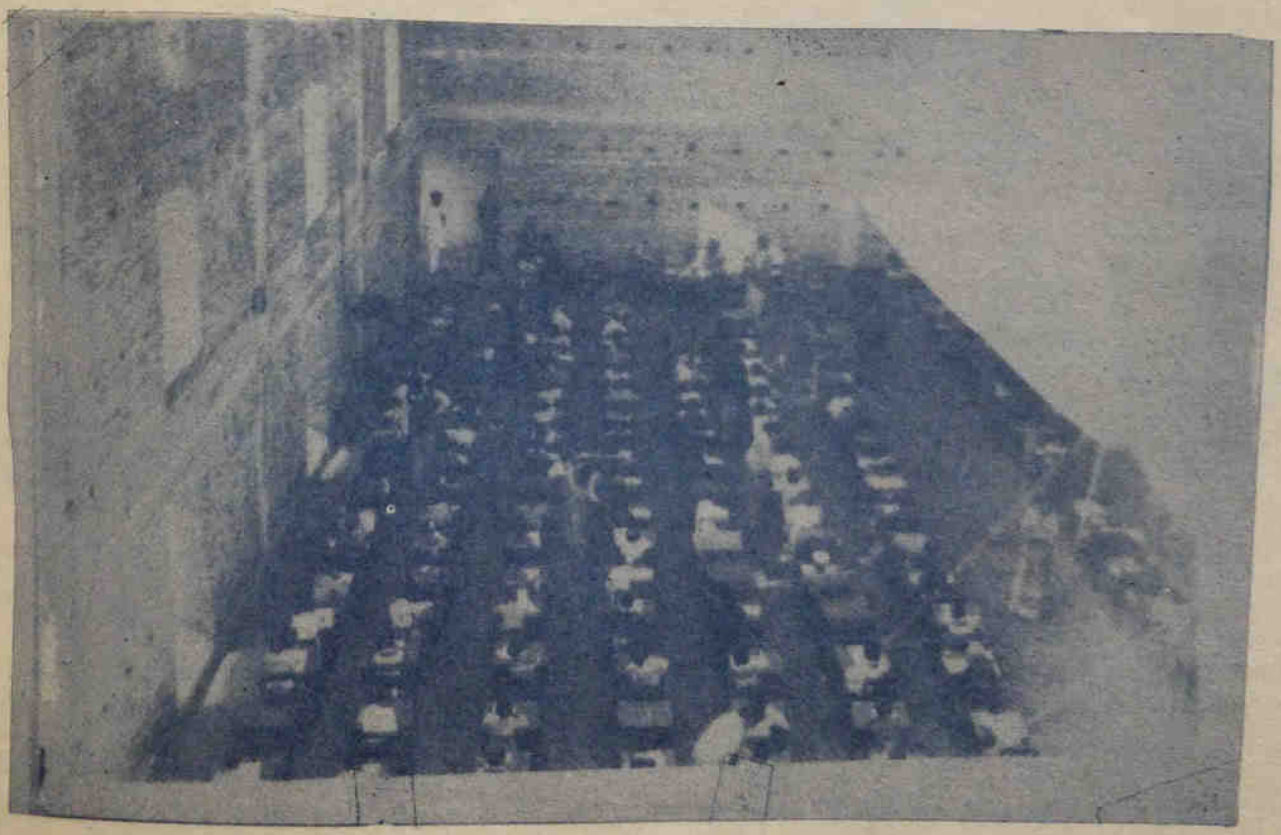

ভর্তি পরীক্ষার দৃশ্য

তারা দেশ ও জাতিকে বড় করে তুলেছে বিশ্বের কাছে। তাদের সম্মানে সম্মানিত তাদের দেশ ও জাতি। তাই জাতীয় জীবনে খেলাধূলার মূল্য অপরিসীম। খেলাধূলার মান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে জাতিও তার আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনে খেলাধূলার ভূমিকা অপরিসীম। তাই ভাল খেলোয়াড় সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য ভাল খেলোয়াড় সৃষ্টি কষ্টসাধ্য সাধনা। এ বিষয়ে ক্রীড়ামোদী মহল তথা সরকারের সর্ব প্রকার সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত। খেলাধূলার উন্নতি বিধান কল্পে জাতীয় ক্রীড়াশিবির প্রতিষ্ঠা করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে উৎসাহী তরুণ-তরুণীদের একত্রিত করে প্রশিক্ষণ দান অত্যাবশ্যক। এতে ক্রীড়ার মান তথা জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সুষ্ঠু প্রশিক্ষন পেলে দেশের উদ্দমশীল তরুণ ও তরুণীরা অচিরেই ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মধুসূদনের কাব্যে নারী ব্যক্তিত্ব

আবদুর রাজ্জাক
প্রভাষক

নারীকে তার আপন ভাগ্য গড়ে নেবার অধিকার দানের জন্য একদিন কবিগুরু ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। অবশ্যি, রবীন্দ্র-পূর্ব অথবা রবীন্দ্র-সমকালীন বিভিন্ন নারী—কুন্দ রোহিনী, ভ্রমর-শৈবলিনী কিংবা বিমলা-বিনোদিনী-লাবণ্য অথবা রমা-কমল, রাজলক্ষী-অভয়া-প্রভৃতি আপনাপন মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে প্রয়াসী হয়েছে সত্য; তবু বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ কাল পর্যায় অবধি নারীর স্বীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অস্বীকৃতির যুক্তিনির্ভর তথ্য এই প্রার্থনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু তা' সত্বেও এ প্রেক্ষিতে এটুকু প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, উনিশ শতকের প্রদোষে আধুনিকতার প্রস্তুতি পর্বেই সর্বপ্রথম মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্যের নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে নারীর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বোধের স্পষ্টতর চিহ্ণ সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক জীবন ও গোষ্ঠী-জীবন বোধের নৈর্ব্যক্তিক অস্পষ্টতায় নারী ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করণ সম্ভব ছিল না; চর্যাপদের 'শবরী' তার 'শবরের' শূন্যবাদের সাধনার বেদীতে অথবা 'ডোম্বী' 'বাহমন নাড়িয়ার' কামনা-বিলাসের যূপকাষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করতে বাধ্য হয়েছিল। বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের জীবাত্ম-স্বরূপিনী শ্রী রাধিকার দেবী মূর্তির মধ্যে মানবিকতার অবকাশ কোথায়? ভারত চন্দ্রের 'সুন্দর'-দয়িতা 'বিদ্যার' ব্যক্তিত্বও মধ্যযুগীয় সামন্ত-দরবারী জীবনাচরনের আবিল আবর্তে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এমন কি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী'ও আপন ব্যক্তিত্বে ভাস্বর নয়।

কিন্তু উনিশ শতকের শুরুতে এই মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা অবসিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মূল্যবোধ উদ্বোধিত হয়েছে। উনিশ শতকীয় বাংলার রেঁনেসাস-উত্তর জীবন-বাসনা পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর জীবন-চেতনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। এই রেঁনেসাসের ফলশ্রুতি— পারলৌকিকতা থেকে ঐহিকতায়, ধর্মকেন্দ্রিকতা থেকে মানব-মুখিতায়, গোষ্ঠী জীবনবোধ থেকে ব্যক্তি ও স্বাতন্ত্রবোধ এবং নারী অবরোধ থেকে নারী ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিতে উত্তরণ। বলা বাহুল্য, ডিরোজিওর বিপ্লবী চেতনা এবং রামমোহন-বিদ্যা-সাগরের সমাজ-কেন্দ্রিক মহাসাধনা এই জীবনানুভূতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বিলোপের মধ্য দিয়ে নারীর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের মধ্য দিয়ে সেই স্বাতন্ত্র আরো সুগভীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুতঃ রেঁনেসাসের এই মর্মবাণী এবং জীবনানুভূতিই মধুসূদনের কাব্যের প্রায় সকল নায়িকার মধ্য দিয়েই অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

মানুষের হৃদয়াবেগ অতি প্রচণ্ড ও দুর্নিবার। প্রাকৃতিক কারণেই নারীর অবদমিত হৃদয়াবেগ আরো প্রচণ্ড ও তীব্রতর। কিন্তু আগেই বলেছি; স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষ-শাসিত সমাজের গণ্ডির মধ্যে নারীর এই অব্যক্ত হৃদয়াবেগ গুমরে ফিরেছে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, কাব্য, পুরান, প্রচলিত নীতিবোধ ও ভগবানের দোহাই দিয়ে পুরুষ সমাজ নারীর হৃদয়াবেগকে অস্বীকার করেছে। অথচ এই চিরলালিত নীতিবোধ ও ধর্মশাস্ত্রর অন্তঃসারশূন্য হিতোপদেশ একান্তভাবেই ভগবান-নিরপেক্ষ। তাই উনিশ শতকীয় মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মানব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি মধুসূদন এই মানবতাকে নীতিবোধের উপর মানবিক মুল্যবোধকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের নায়িকারা, তাই আপনাপন মনোভাব প্রকাশে সলজ্জ বা সকুন্ঠ নয়।

মধুসূদনের কাব্যে তো বটেই সারা বাংলা সাহিত্যে যে নারী সর্বপ্রথম অবরোধ ভেঙ্গে গৃহসীমার চার দেয়াল অতিক্রম করে বাইরের মুক্তাঙ্গণে পা রেখেছে, সে ইন্দ্রজিত ভার্যা প্রমীলা। প্রখর আত্মমর্যাদা ও দুর্জয় আত্মশক্তিতে বিশ্বাসিনী, কোমলে কঠোর এই নারী পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে যুদ্ধ সংকুল লঙ্কায় স্বামী সন্নিধানে গমন করেছে। শুধু তাই নয়, বাসন্তী সখীর ভীতি প্রদর্শনে অবজ্ঞা ও দম্ভভরে বলেছে—

কি কহিলি বাসন্তী, পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে
কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষকুল বধূ
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?

কিন্তু এ নারী একাধারে বীরাঙ্গনা ও কুলবধূ। পতি-মিলন যাত্রায় যে কর্তব্য-কঠোর, পতির বিরহে সে অশ্রুমুখী। শুধু তাই নয়, সে যে বীর-শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিত-ভার্যা এবং মহাপরা ক্রমশালী রাবণের পুত্রবধু এ আত্মমর্যাদা বোধ ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হয় না। শক্তিতে, বীর্যে, প্রেমে ও আত্মমর্যাদাবোধে এ নারী বাংলা সাহিত্যে অনন্যা।

গৃহসীমা অতিক্রমী এই নারী মূর্তি দেখে সমকালীন বাঙালী একে বাংলায় কল্পনার নারী বলে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তবু একথা সত্য যে প্রমীলা উনিশ-শতকের নবজাগরণের পটভূমিকায় কবি মধুসূদনের আদর্শ মানস-কন্যা।

বীরাঙ্গনা কাব্যে 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় 'তারার' হৃদয়াবেগ ও ব্যক্তিত্বের অকুন্ঠ প্রকাশ লক্ষ্যযোগ্য। সোমের প্রতি তারার আসক্তি সমাজ বিগর্হিত হলেও তা একান্তই মানবিক ও স্বাভাবিক। 'তারা' তপোবন নিবাসী ঋষি-পত্নী। ঋষির নিকট তপোবনের সাধনা ও ভগবানের সান্নিধ্য আকাঙ্খিত হলেও 'তারার' নিকট লোভণীয় ছিল প্রাণ-প্রবাহে প্রদীপ্ত দেবকান্তি তরুণ। সুতরাং 'সোমের' আগমন-লগ্নেই 'তারা' তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে—

যেদিন প্রথম তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনী সম এ পরাণ মম
উল্লাসে ভাসিল মন আনন্দ সলিলে।

ক্রমান্বয়ে 'তারা' অনুরাগের সঞ্চার, বৃদ্ধি ও প্রচণ্ডতার বর্ণনা দিয়েছে। কখনও সমাজ বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে---

হা ধিক! কি পাপে
হায়রে কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিল
এ ভালে, জনম মম মহাঋষিকুলে
তবু চণ্ডালিনী আমি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই হৃদয়াবেগ সমাজনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

কলঙ্কী শশাঙ্ক তোমা বলে সর্বজনে
কর আসি কলঙ্কিণী কিঙ্করী তারারে
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে
এস হে তারার বান্ছা।

তারার এ জীবন-বাসনা আধুনিক জীবনবোধেরই পথিকৃত। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র একান্তভাবেই আধুনিক জীবন চেতনার ফলশ্রুতি, বিশেষতঃ নারী ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবেই অর্বাচীন কালের। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গোষ্ঠীপতির নির্দেশ এবং স্বধর্মবিধি নির্বিচারে পালনেই শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হতো। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যের নায়িকারা পৌরাণিক যুগের অধিবাসী হলেও তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের আরোপে ও উজ্জ্বল রূপায়ণে নতুন জীবন মূল্যবোধের অনিবার্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তার কাব্যের নায়িকারা হৃদয়াবেগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপন স্বাতন্ত্রও প্রকাশ করেছে একান্তভাবেই।

বাল্মীকির পৌরানিক 'কেকয়ী' স্বামীর কার্যাবলীর সমালোচনার অধিকারী ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের 'কেকয়ী' মিথ্যাভাষণের জন্য পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতিকে শুধু তির্যক বাক্যবানেই জর্জরিত করেনি বরং ধিক্কার দিয়ে নিজের আহমিকা প্রকাশ করেছে---

হা ধিক! কি কবে দাসী গুরুজন তুমি,
নতুবা কেকয়ী দেব, মুক্তকন্ঠ আজি
কহিত – অসত্যবাদী রঘুকুলপতি।
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে
ধর্ম শব্দ মুখে, গতি অধর্মের পথে।

পুত্রহীনা জনাও পুত্র হন্তার প্রতি স্বামীর (নীলধ্বজের) সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এমনি বাক্যবানে জর্জরিত করেছে---

তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে।

'অর্জুনের' প্রতি দ্রৌপদীর ব্যবহার একান্ত ভাবেই আধুনিক নারীর আত্মমর্যাদাবোধের স্মারক। পঞ্চ স্বামীর প্রতি বিশ্বাস থাকাই পৌরাণিক যুগের দ্রৌপদীর চরম নারীত্ব বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু এ যুগে নারীর প্রধান কামনা প্রনয়াসপদকে অদ্বিতীয় হিসাবে কল্পনায়। এবং এ

যোগ্যতার আলেখ্য হিসাবে দ্রৌপদী আধুনিকা, আলোচ্য পত্রে এর উল্লেখযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে--প্রথমতঃ কুমারী জীবনে অর্জুনকে বর হিসাবে কল্পনায়, দ্বিতীয়তঃ স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদকালে অর্জুনের জয়ের জন্য প্রার্থনায়, তৃতীয়ত বিবাহ-উত্তর কালে শ্রদ্ধা ও প্রেমে অর্জুনকেই একমাত্র আরাধ্য ভাবার মধ্যে।

পাঞ্চালীর চির বান্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়। এই জানি, এই মানি মনে।

আধুনিক জীবন-চেতনায় প্রেম ও দেহজ কামনা সমধর্মী না হলেও একে অন্যের পরিপূরক। প্রেমের আলোচনায় তাই স্বাভবতঃ দেহবাসনার প্রশ্ন আসে। রজকিনীর কামগন্ধহীন প্রেমের বিস্তার এ কালের রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু এ ধারনা শুচি স্নিগ্ধতার পরিচয়বাহী হলেও জীবনের মৌল সত্যকে অস্বীকার করে। মধুসূদন জীবনের এই দুই মৌল আবেদনকে পাশাপাশি রেখেছেন---প্রেমকে দেহ বাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন উৎকেন্দ্রিক সত্ত্ব হিসাবে কল্পনা করেননি। লক্ষণের প্রতি শূর্পনখার প্রেমালেখ্য এই আদর্শের পরিচয়বাহী।

মধুসূদনের শূর্পনখা আর পুরান-বর্ণিত রাক্ষসী মাত্র নয়। সে প্রেমাদর্শে বিশ্বাসিনী দয়িত-অন্ত-প্রাণ এক আদর্শ প্রেমিকা, যে প্রেমিকের জন্য নিজের সর্বস্ব দানেও দ্বিধান্বিতা নয়। এ প্রেক্ষিতে কেকয়ীর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কেকয়ীর প্রতি রাজা দশরথের বিরাগের কারণ হিসাবে তিনি তার গতায়ু যৌবনকেই দায়ী করেছেন নির্দ্বিধায়।

সুতরাং আমাদের প্রাগুক্ত বক্তব্য অনুসরণে একথা বলা যেতে পারে পুরাণ-বর্ণিত দেব-কল্প বিভিন্ন নারীই মধুসূদনের কাব্যে হৃদয়াবেগের অকুণ্ঠ প্রকাশে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সুস্পষ্ট স্বীকৃতিতে এবং দেহ কামনার অভিব্যক্তিতে নবকলপতা পেয়েছে। এবং জীবন ভাবনায় এরা একান্ত ভাবেই আধুনিক মননের উপযোগী। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ থেকে শুরু করে অধুনা কালসীমা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের নারী সমাজ আজ যে তাদের স্বীয় মর্যাদায় ও ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার জন্য মধুসূদনের কাব্যের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র তাদের পূর্বসূরীত্ব দাবী করতে পারে এবং সম্ভবতঃ এরাই তাদের পথিকৃৎ।

চিরন্তন

শাহ মুহম্মদ জহরুল হক
উপাধ্যক্ষ

শতেক বছর পরেও অসীমের কোন প্রান্তে
নীহারিকা---ছায়াপথের দীপ্তি
উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে আলোক তরঙ্গের ঢেউ তুলবেই।

পৃথিবীর ক্ষুদ্র বিন্দু কেনেডি স্পেস রিসার্চ সেন্টার
সংকেত পাঠাবে তখনো---
মহাশূন্যযানের কাউন্টডাউন হবেই।
যদিও থাকবেনা অল্‌ড্রিন আর্মষ্ট্রং ভেলেন্টিনারা।

দৃশ্য মিলাবে না, সব কিছু---
গ্রহান্তরে টেলিভিশনের পর্দায় ধরা পড়বেই।
মস্কো, পিকিং অথবা ঢাকার
বিস্মৃত ঘটনাগুলিও শব্দ তরঙ্গে মিশবেই।

শতেক বছর পরেও সুনয়না থাকবে---
ষোড়শীর হৃদয় নিয়ে,
কোন এক জীবনের ছন্দে তোলপাড় করবেই।

পৃথিবীর জাত-ভাই নেপচুন প্লুটো
অথবা মঙ্গলের কম্পিউটরগুলি
সঠিক জবাব দিবেই।

জুনিয়র রেডক্রস প্রসঙ্গে

ইমাম হোসেন
দশম মানবিক
স্কুল নং ১৭২০

পৃথিবীর সব ধর্মেই দুর্গত মানুষের সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই প্রাচীনকালে থেকেই লোক চক্ষুর অন্তরালে নীরবে বহু মানবপ্রেমিক দুর্গত মানুষের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তারাই হলেন প্রকৃত বীর। যুদ্ধের সময় মানবতাবোধ হয় ভূলুণ্ঠিত। তাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা করে ফ্লোরেন্স নাইটএঙ্গেল এক রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। ১৮৫৯ সালে ইটালীর সোলফারিনোতে অনুষ্ঠিত ফ্রাঙ্কো-ইটালিয়ান ও অষ্ট্রিয়ান সৈন্যদের মাঝে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের বিভীষিকা মানব প্রেমিক জাঁ হেনরী দুনার হৃদয়কে করলো বিদীর্ণ ও বিবেককে করলো আহত। লিখলেন তিনি তার সাড়া জাগানো বই "সোল ফারিনোর স্মৃতি (A Memory of Solferino)। এ বই সারা ইউরোপের বিবেককে সাড়া দিল। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮৬৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ১৬ জাতি সম্মেলনে যুদ্ধের সময় আহতদের দেখা শোনা করার জন্য প্রত্যেক দেশে এক কমিটি গঠণের প্রস্তাব করা হয়। এ কমিটি হবে নিরপেক্ষ ও সেনাবাহিনীর সাথে তারা কাজ করবে। ১৮৬৪ সালে-আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির জন্ম হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রেডক্রসের শাখা আছে। কিশোরদের সমন্বয়ে গঠিত রেডক্রসের অঙ্গকে জুনিয়র রেডক্রস বলা হয়।

১৯৬২ সালের 8ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলের জুনিয়র রেডক্রস দলের সৃষ্টি হয়। এ সময় এর সর্বাঙ্গীন দায়িত্বে ছিলেন স্কুলের শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব ফিরোজ আহমেদ চৌধুরী। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মডেল স্কুলের জুনিয়র রেডক্রস দল সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। ঐ সময় করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জুনিয়র রেডক্রস কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আমাদের স্কুলের ছেলে খুররম জহীরউদ্দিন মনোনিত হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের জুনিয়র রেডক্রসের সদস্যরা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির মহাসচিব মিঃ হেনরীক বীয়ারও এ স্কুল পরিদর্শন করেন।

বোধগম্য কারণে ১৯৭২ সালের পর এ আন্দোলন কিছুটা শ্লথ হয়ে আসলে এ স্কুলের শিক্ষক জনাব হেলালউদ্দিন ও জনাব আলমগীর কবীরের হাতে রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলের জুনিয়র রেডক্রস দল নূতন প্রাণস্পন্দন লাভ করে। বর্তমানে এ জুনিয়র রেডক্রসের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৩ জন ও এর দায়িত্বে আছেন জনাব হেলালউদ্দিন। এদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা সহ প্রয়োজনীয় সব রকম প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করা হবে। মানবতার ডাকে সাড়া দিতে আমাদের ছেলেরা যে কখনোই পিছপা হবে না, এ দৃঢ় বিশ্বাস সবার আছে।

স্কাউটিং ও কাবিং সম্বন্ধে দু'টি কথা

মোস্তাক আহমদ মানিক
প্রভাষক

তারুণ্যের উদ্দীপনা, উচ্ছাস ও প্রাণশক্তিকে সুশৃংখলভাবে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলে দু'টা স্কাউট দল ও দু'টা কাব প্যাক রয়েছে। কর্ণেল রহমান ভবন ও শহীদ নিজামউদ্দিন আজাদ ভবনের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত এ দু'টি স্কাউট দল ও কাব প্যাকের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত। ১৯৬৫ সালে এ স্কুলের শিক্ষক জনাব ফজলুল হক সরকার, জনাব শেখ মোহাম্মদ ওমর আলী, জনাব এ, কে, এম, আবদুল মান্নান, জনাব মাহবুব আমজাদ ও শ্রী কে, কে, সরকারের হাতে এ স্কাউট দল ও কাব প্যাকের গোড়া পত্তন হয়। তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে এ স্কুলের স্কাউট ও কাবরা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্কাউট আন্দোলনে এক অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। তখন সারা দেশের শ্রেষ্ঠ স্কাউট দলগুলোর মাঝে রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলের স্কাউট দল দু'টো ছিল অন্যতম।

১৯৭২ সালের পর নানা বোধগোম্য কারণে সারা দেশের স্কাউট আন্দোলনে পড়ে ভাটা। এ স্কুলও ছিল না ব্যতিক্রম। নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝ দিয়ে এ স্কুলের স্কাউট দল ও কাব প্যাককে পুনর্গঠিত করা হয়। বর্তমানে স্কাউটিং ও কাবিং এর দায়িত্ব আছেন জনাব মাহবুব আমজাদ, শ্রী কে, কে, সরকার, জনাব আলমগীর কবীর ও লেখক নিজে।

গত জানুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত স্কুলের বার্ষিক তাঁবু বাসের সময় শিবির এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয় স্কাউট ও কাবদের উপর। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্কাউট ও কাবদের আকর্ষণীয় কুচ-কাওয়াজ প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়। এক দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে স্কুলের স্কাউট ও কাবরা গত ২০শে মার্চ তারিখে ঢাকার অদূরে সাভার যায়।

স্কাউট ও কাবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলছে। প্রতি শুক্রবার ও সোমবারে স্কাউটিং ও কাবিং এর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এ সব ক্লাসে হালকা পরিবেশে খেলার ছলে স্কাউটিং ও কাবিং-এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া তাদের মানবিক গুণ ও সৃজনশীল প্রতিভা যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে, সেদিকেও বিশেষ খেয়াল দেয়া হয়।

স্কুল কর্তৃপক্ষের বাস্তব সহযোগিতা ও ছাত্রদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ স্কুলের স্কাউট ও কাবরা খুব তাড়াতাড়িই সারা দেশে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারবে—এ বিশ্বাস সবার আছে। জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সদা প্রস্তুত আমাদের স্কাউট ও কাব দল মানবতার সেবায় তাদের হাত প্রসারিত করবে—এ আশা আমাদের আছে।

খেলাধূলা

আবদুল গফফার (লাল)
দশম শ্রেণী
স্কুল নং ১৫০২

আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনের অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক গুণ অর্জনের অন্যতম পথ হিসাবে শারীরিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। "সুস্থ শরীর উচ্চ মনের আধার" এই প্রবাদ বাক্যটি ছেলেরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চেষ্টা করে। কাজেই কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ জীবনে, কি রাষ্ট্রগঠন কাজে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্ত খেলাধূলার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছাত্রকে স্কুল চলাকালীন প্রতিদিন সকালবেলা পিটিতে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। বিদ্যালয়ের ৪টি ছাত্রাবাস বা হাউসের জন্য চার জন অভিজ্ঞ শারীরিক শিক্ষাবিদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পি, টি, স্কাউটিং, কাবিং, রেডক্রস, ব্যাণ্ড এবং বৈকালিক বাধ্যতামূলক খেলাধূলার নিয়মতি প্রশিক্ষণ দিয়া থাকেন। সবরকমের খেলাধূলার ব্যবস্থা এখানে রহিয়াছে। আউটডোর খেলার মধ্যে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, বাসকেটবল, ভলিবল, সাঁতার এবং এ্যাথলেটিকস, আর ইনডোর খেলার মধ্যে ক্যারম, দাবা ও টেবিল টেনিসই প্রধান।

প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানেও বিপুল উত্তেজনার মধ্যে আন্তঃহাউস আউটডোর এবং ইনডোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ছাত্রগন নিজেদের হাউসের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য আপ্রান চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাতে প্রতিযোগিতা হইয়া উঠে অত্যন্ত তীব্র এবং প্রানবন্ত। খোলায়াড় এবং দর্শক উভয়েই প্রচুর আনন্দ পাইয়া থাকে। ১৯৭৬-১৯৭৭ সনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হইল ঃ—

আন্তঃহাউস খেলাধূলা (জুনিয়র হাউস)

খেলা	হাউস	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ড্র
ফুটবল	১নং হাউস বনাম ২নং হাউস	১নং	২নং	
হকি	,,	—	—	ড্র
ভলিবল, বাসকেটবল এবং ক্রিকেট	ঐ	১নং	২নং	

আন্তঃ হাউস---ইনডোর (জুনিয়র হাউস)

খেলা	হাউস	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ড্র
ক্যারম	১নং বনাম ২নং হাউস	১নং	২নং	
দাবা	ঐ	২নং	১নং	
টেবিল টেনিস	ঐ	২নং	২নং	

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় (জুনিয়র হাউস) ১নং হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

জুনিয়র হাউসে সার্বিক ভাবে ১নং হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়।

আন্তঃহাউস—আউটডোর গেম (সিনিয়র হাউস)

খেলা	হাউস	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ড্র
ফুটবল	নজরুল ইসলাম হাউস বনাম ফজলুল হক হাউস	নজরুল ইসলাম হাউস	ফজলুল হক হাউস	
হকি	ঐ	,,	,,	ড্র
ক্রিকেট, ভলিবল এবং বাসকেটবল	ঐ	ফজলুল হক হাউস	নজরুল ইসলাম হাউস	

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (সিনিয়র হাউস)

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে নজরুল ইসলাম হাউস।

ইনডোর গেম (সিনিয়র হাউস)

খেলা	হাউস	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ড্র
ক্যারম	নজরুল ইসলাম হাউস বনাম ফজলুল হক হাউস	নজরুল ইসলাম হাউস	ফজলুল হক হাউস	
দাবা এবং টেবিলটেনিস	ঐ	ফজলুল হক হাউস	নজরুল ইসলাম হাউস	

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা (সিনিয়র হাউস)

নজরুল ইসলাম হাউস চ্যাম্পিয়ন।
বড়দের শাখায় সার্বিকভাবে ফজলুল হক হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়।

আন্তঃস্কুল খেলাধূলা

ফুটবল ..... জোন চ্যাম্পিয়ন
ভলিবল ..... ঐ
বাসকেটবল ..... ঐ
হকি ..... রানার্স আপ (ঢাকা সিটি)

আন্তঃস্কুল ক্রীড়া

বাৎসরিক তাঁবুবাসের জন্য স্কুলের বড় ছেলেরা আন্তঃস্কুল এ্যাথলেটিকস-এ অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। জুনিয়র গ্রুপে জোনে ৩টি এবং সিটিতে ১টি পদক লাভ করে।

জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ ঃ (মোহাম্মদপুর থানা অঞ্চল)

হকি ও ক্রিকেট খেলায়—চ্যাম্পিয়ন
ভলিবল, ফুটবল এবং বাসকেট বল খেলায়— রানার্স আপ।

আন্তঃস্কুল সাঁতার ঃ (মোহাম্মদপুর থানা অঞ্চল)

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল দল চ্যাম্পিয়ন।

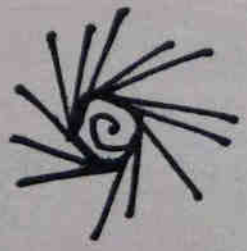

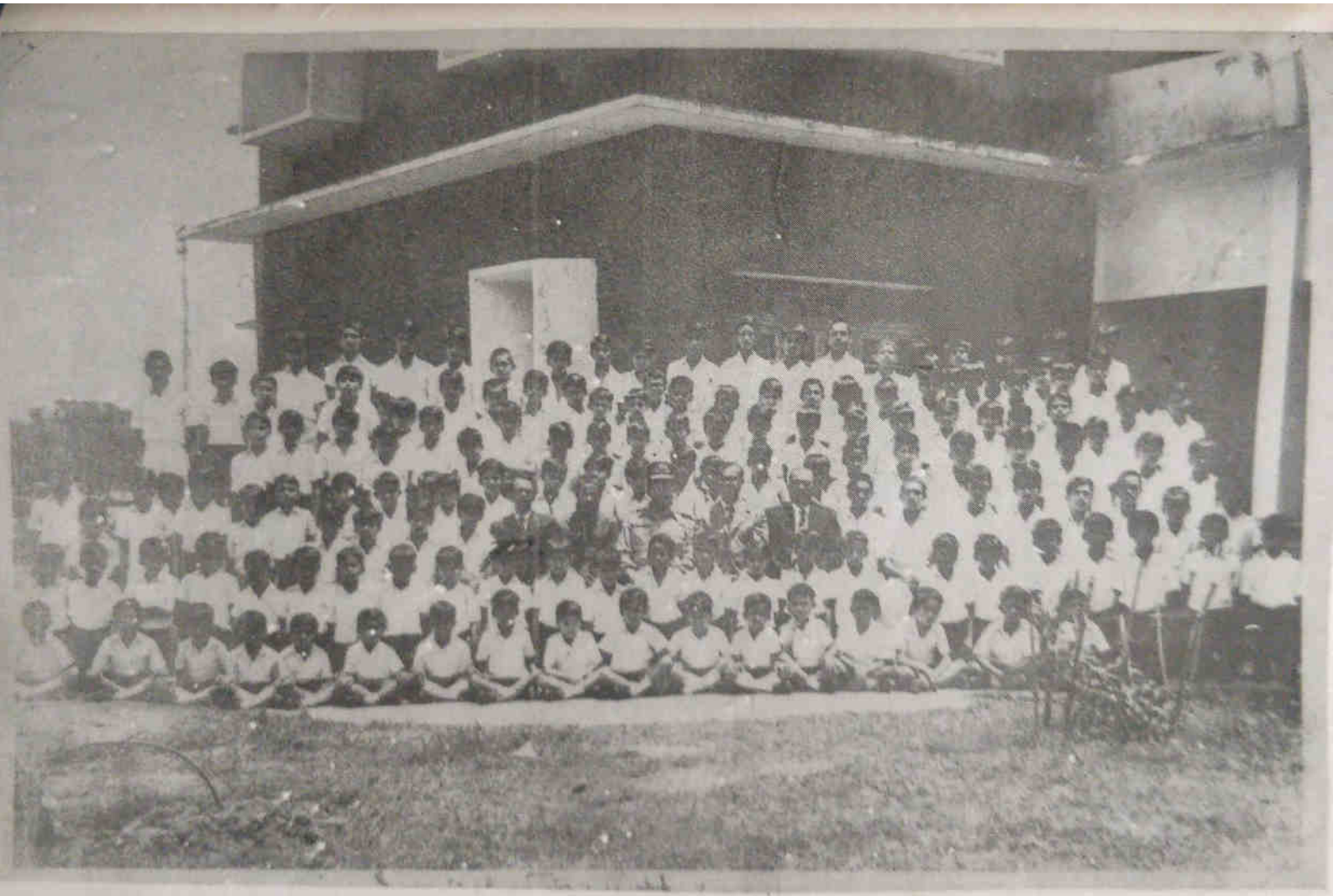

এক সমুদ্র ছাত্রাবাস

স্কুল ফুটবল টিম

১নং হাউস (ছাত্রাবাস)

হাউস মাষ্টার	জনাব মোহাম্মদ আহসানুল্লাহ (আবাসিক)
	জনাব গোলাম মর্তুজা (,,)
হাউস টিউটার	জনাব প্রলয়কুমার গুহ নিয়োগী (অনাবাসিক)
	জনাব মুস্তাক আহমদ মানিক (এনেক্সী হাউসে কর্তব্যরত)
হাউস এলডার	মাষ্টার নাজাকত হোসেন (৭ম শ্রেণী)
হাউস প্রিফেক্ট	মাষ্টার সাদী তালুকদার (৭ম শ্রেণী)

১৬৫ জন আবাসিক ছাত্রের আসন সম্বলিত এই সুবৃহৎ ছাত্রাবাসটিতে বর্তমানে ১৫৬ জন ছাত্র বাস করছে। তাদের বয়স ৬ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে। এ বছর এখানে নবাগত কচি-কাঁচাদের সংখ্যা ৪৬ এবং এখান থেকে বড়দের শাখায় স্থানান্তরিত কিশোরদের সংখ্যা ১৮ জন।

এ ভবনের পুরাতন ছাত্ররা যারা জীবনের আনন্দমুখর মধুময় শৈশবটুকু কাটিয়েছে এখানে, কৈশোরে তাদের বিদায় বেলায় এবং নবাগত কচি-কাঁচাদের কলা-কাকলি মুখরিত আগমন মুহূর্তটিতে এ ছাত্রাবাসের প্রানে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সাড়া জাগে। তাই প্রতি বছরই বিদায়ী ও নবাগতদের প্রতি প্রানঢালা সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে ছাত্ররা নিজেরাই একটি সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কচি-কাঁচাদের বক্তৃতা, গান, কৌতুক, নাট্য প্রতিভা, প্রভৃতির সুষ্ঠু বিকাশের পথ সুগম হয়। পুরাতনদের বিদায় ও নবীনদের বরণের উদ্দেশ্যে বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী এমনি এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় অধ্যক্ষ কর্নেল জিয়াউদ্দীন আহমেদ। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের পেছনে ছাত্রদের উদ্যম এবং বিগত বছরটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মতৎপরতার ও সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী হওয়ার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রানিত করেন।

এ ছাত্রাবাসটির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হ'ল এখানকার আবাসিক ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা। হাউস মাষ্টার কর্তৃক ছাত্রদের মধ্য হ'তে নিযুক্ত একজন হাউস এলডার ও একজন হাউস প্রিফেক্টসহ মোট ৩৬ জন প্রিফেক্ট ছাত্রাবাস পর্যায়ে স্কুলের দৈনন্দিন কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি বছর একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক অনাড়ম্বর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক মণ্ডলী ও হাউজের সমস্ত ছাত্রের উপস্থিতিতে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের শপথ গ্রহণ করে। পাঠ অনুশীলন কালে, খাবার ঘরে, নামাজ কক্ষে, কমনরুম ও মাঠে ময়দানের খেলাধূলায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে এবং ছাত্রবাসের পরিস্কার পরিছন্নতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রিফেক্টবৃন্দ ছাত্রদের মাঝে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করে থাকে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ছাত্রাবাসের কৃতিত্ব চমকপ্রদ ও ঐতিহ্যবাহী। নিজ নিজ শ্রেণীর শীর্ষ স্থানগুলোর অধিকাংশই অধিকার করে আসছে এ ছাত্রাবাসের ছাত্ররা। গত শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শাখাতেই সেরা ছাত্রের গৌরব অর্জন করেছে এ হাউসেরই ছাত্র যথাক্রমে রিজওয়ান করিম চিশতী (৩য় শ্রেণী) এবং এ, কে, এম, সালেক (৭ম শ্রেণী)। এতদ্ব্যতীত, তৌফিকুল ইসলাম (১ম শ্রেণী), তারিকুল রশীদ চৌধুরী (৩য় শ্রেণী), কাজী শাহাদাৎ হোসেন (৫ম শ্রেণী), জাভেদ মাহমুদ (৭ম শ্রেণী), প্রমুখ কৃতী ছাত্ররা লেখাপড়ায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ছাত্রাবাসের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তারা ছাত্রাবাসের গৌরব।

পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম উভয় ক্ষেত্রেই ১নং ছাত্রাবাসের ছাত্রদের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের এক সুমহান ঐতিহ্য রয়েছে। বিগত বছরটিতেও তারা এ ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হ'য়েছে। লেখাপড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আযান ও কিরাত, বৃক্ষরোপণ, ইন-ডোর গেমস, আউটডোর গেমস—ছোটদের শাখায় এই সাতটি আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতার ছয়টিতেই বিজয়ী হ'য়ে এরা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মানের প্রতীক "আন্তঃহাউস চ্যাম্পিয়ান-শীপ কাপ" অর্জন করে। পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও সাধনাকে সম্বল করে তারা সামনের দিনগুলোতে আরও গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব অর্জনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

এ ছাত্রাবাসের ভেতরে ও বাইরে যাঁদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসেবে গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের এ সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, এ ছাত্রাবাস তাঁদের সবাইকে জানাচ্ছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২নং হাউস (ছাত্রাবাস)

হাউস মাষ্টার	জনাব আতাউল হক
হাউস টিউটর	জনাব তাজুল ইসলাম
হাউস এল্‌ডার	মাষ্টার খালিদ হাসান মাহমুদ (৭ম শ্রেণী)
হাউস প্রিফেক্‌ট	মাষ্টার খুরশীদুজ্জামান (৭ম শ্রেণী)

শিক্ষা এবং জ্ঞান সাধনার সাথে সাথে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের জন্য ঢাকা রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলের যেমন এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে তেমনি আবাসিক ছাত্রদের জীবনকে সুন্দরের পথে পরিচালিত করার জন্য এই স্কুলের 'হাউস'-গুলোর বিশেষ অবদান সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জাতীয় জীবনকে এক মহিমান্বিত রূপ দেবার গভীর আগ্রহ নিয়ে ১৯৬০ সালে এই বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। তার এক বছর পরেই ১লা মে, ১৯৬১ সালে, অল্প বয়সী কিশোর ছাত্রদের প্রয়োজনে ২নং হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬১ সালে এই হাউসের প্রারম্ভ পর্বে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন, পরবর্তী পর্যায়ে এই একতলা ছাত্রাবাসের কিছু অংশকে দ্বিতল করা হয়েছে এবং বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে ১৩০ জন। এ বছর এই হাউস থেকে ১৩ জন ছাত্রকে সিনিয়র উইং ছাত্রাবাসে পাঠানো হয়েছে, অপরদিকে ১ম শ্রেণীতে ১৫ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১৩ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৪ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৩ জন ও ৭ম শ্রেণীতে ১ জন মোট ৩৬ জন ছাত্রকে আবাসিক ছাত্র হিসাবে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।

এই ছাত্রাবাসের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ছাত্রদের চরিত্র এবং জীবনকে সুমহান করে গড়ে তোলা, তাদেরকে প্রগতিশীল ও কর্মক্ষম করে তোলা। তাই শুধু পাঠ্য পুস্তকের অন্তরালে তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয় না; বরঞ্চ সকল প্রকারের সহপাঠ্যক্রম কার্যে, এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। বিশেষ করে হাউসের সকল কর্মে ছাত্রদেরকেই নেতৃত্বদানের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় এবং ছাত্ররাই নিজ নিজ কর্তব্য সুচারু রূপে পালনের মাধ্যমে ছাত্রাবাসের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকে।

এই হাউসের ছাত্ররা স্কাউটিং, কাবিং, ব্যাণ্ড, বক্তৃতা, আবৃতি, আযান-কেরাত ও চারুকলা এবং কারুশিল্পে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তারা নিত্যকার 'মর্নিং, পি, টি,'তে, সাপ্তাহিক 'হাউস ক্লিনলিনেস্' প্রতিযোগিতায়, মার্চ পাষ্টে, এ্যাসেম্বলীতে সংবাদ পাঠে ও কোরাণ তেলাওয়াতে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা এবং নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত অংশ নিয়ে

থাকে। তারা প্রতিপর্বে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে এবং সেখানে তারা স্বরচিত কবিতা, গান এবং কৌতুক পরিবেশনের মাধ্যমে সৃষ্টিধর্মী মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। হাউসে তারা নিয়মিত দেওয়াল পত্রিকাও প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান অধ্যক্ষ সাহেবের উপদেশ মত এই হাউসের ছাত্ররা হাউস সংলগ্ন নির্ধারিত স্থানে গত দু' বছর থেকে বৃক্ষ রোপণ করে আসছে এবং নিজেরা ঐ সকল বৃক্ষের সর্বপ্রকার সেবা যত্ন করছে। বর্তমানে এই হাউসের ৫৭টি বাড়ন্ত সবুজ বৃক্ষ ছাত্রাবাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এই হাউসের ছাত্রদের নিজ হাতে কাজ করার মহান আদর্শের স্বাক্ষর বহন করছে।

২নং ছাত্রাবাস ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত 'জুনিয়র উইং চ্যাম্পিয়নশীপ' লাভ করে। ১৯৭৪ সালে এই হাউস চ্যাম্পিয়নশীপের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেও পরবর্তী বছর ১৯৭৫ সালে আবার তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনে এবং গত বছর এই হাউস 'রানার্স-আপ' হয়।

সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিতর্ক, বক্তৃতা, আবৃত্তি ইত্যাদিতে ছাত্ররা অন্যান্য হাউসের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে প্রতি বছর প্রতি পর্বে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকে। এ বছর প্রথম পর্বে বক্তৃতায়, বিতর্কে খালিদ হাসান মাহমুদ ও মোস্তফা আনোয়ার কাজমী যথাক্রমে ১ম এবং ৩য় স্থান অধিকার করে এই হাউসের সম্মান ও মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গত বছর ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র খালিদ হাসান মাহমুদ ৩য় স্থান অধিকার করে।

চারু ও কারু বিষয়ক শিক্ষায় এই হাউসের ছাত্ররা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানে 'সিনিয়র উইং হাউসে' অবস্থানরত চারু ও কারু বিষয়ে সুনামের অধিকারী সালহ-উদ্দীন ও আরশাদ আলম এই ছাত্রাবাসেরই প্রাক্তন ছাত্র। তাছাড়া এখানকার ক্ষুদে শিল্পীরাও আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে তাদের পূর্বসুরীদের প্রচেষ্টায় অর্জিত মান এবং সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে।

২নং ছাত্রাবাসের ছাত্ররা বরাবরই পড়াশুনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছে। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই হাউসের ছেলে 'বেস্ট অল্ রাউণ্ডার' শীল্ড লাভ করে হাউসকে গৌরবান্বিত করেছে। এই হাউসের ছাত্র মোস্তফা আনোয়ার কাজমী এবারের প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ১ম গ্রেডের বৃত্তি লাভ করেছে। তাছাড়া খালিদ, ফারুক, বেনজীর, আনিস, আরিফ পরীক্ষায় সর্বদা নিজ নিজ শ্রেণীতে বিশেষ সম্মানীয় স্থান অধিকার করে আসছে। এই ছাত্রাবাসের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ১ম থেকে ৬ষ্ঠ স্থান পর্যন্ত সবগুলি আসন অধিকার করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

২নং ছাত্রাবাস তার স্বীয় মহিমা ও গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখুক এবং ক্রমাগত উন্নতি লাভ করুক এটাই আমাদের কাম্য।

দুই নম্বর ছাত্রাবাস

স্কুল ব্যাণ্ড

নজরুল ইসলাম হাউস

FAZLUL HUQ HOUSE

PAZLUL HUQ HOUSE

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাষ্টার	জনাব আসাইক ইউসুফজাই
হাউস টিউটর	জনাব মোঃ শাহজাহান
হাউস এল্ডার	মাষ্টার সালাউদ্দিন আহমেদ
হাউস প্রিফেক্ট	মাষ্টার আবদুল গাফ্ফার

শুধু নামেই নয়, কর্মেও ছাত্রাবাসটি সত্যিই নজরুল ইসলাম। বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শকে অবলম্বন করেই ছাত্রাবাসটি এক বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছে। আজও এই ছাত্রাবাসের আবাসিক (৭৫ জন) এবং অনাবাসিক ছাত্রদের চলার পথের পাথেয় হচ্ছে কবির সুমহান আদর্শ।

শিক্ষা গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে ছেলেরা আসে। রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলের শিক্ষাগত যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে এ হাউজ-এর ছেলেদের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষায় এ পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ের যে ক'জন ছাত্র মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে তার মধ্যে একজন ছাড়া বাকী সবাই ছিল এ হাউসের ছেলে। তার মধ্যে ঢাকা বোর্ডের এস, এস, সি, পরীক্ষায় ১৯৬৬ সনে কামরুল হায়দার চতুর্থ স্থান এবং ১৯৬৮ সনে এফ, এম, এ, সিদ্দিকী ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে এবং ১৯৭৪ সনের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় মোঃ আলী ফয়সল প্রথম এবং জাফর করিম নবম স্থান অধিকার করে। এছাড়া প্রতি বছরই বিভিন্ন পরীক্ষায় এ হাউসের ছেলেরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এসেছে।

লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধূলায়ও নজরুল হাউসের ছেলেদের কৃতিত্ব কম নয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গত চার বছর ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশীপ অর্জন করেছে এ হাউসেরই ছেলে---১৯৭৩ সনে তামীম, ১৯৭৪-৭৫ সনে মোফাস্বেল ও ১৯৭৬ সনে জামাল। গত বছরও খেলাধূলায় জয়ী হয়েছে এ হাউস। স্কুল ফুটবল ও হকি টিমের বেশীর ভাগ খেলোয়ার এ হাউজ-এরই ছাত্র।

বড়দের শাখার ছাত্রাবাস দু'টোর শুরু থেকেই বিভিন্ন সময়ে চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করেছে এ হাউস। ১৯৭৫ সনে ১৪ নম্বরের মধ্যে ১২ নম্বর পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল নজরুল হাউস। ১৯৭৬ সনে অবশ্যি চ্যাম্পিয়ানশীপ হারিয়ে নূতন বছরের প্রথম থেকেই এ হাউসের প্রতিটি ছাত্র নূতন চিন্তা-ভাবনা, উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করছে হারানো গৌরব ফিরে পেতে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও কাজী নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত এ হাউস-এর ছেলেরা পিছনে পড়ে নেই। শিল্প-কলা, গান-বাজনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় এ হাউসের ছেলেরা বরাবরই সুনাম অর্জন করে আসছে।

চাল-চলন, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজে এ হাউসের ছেলেরা বরাবরই ঐতিহ্য ও কৃতিত্বের অধিকারী।

বহির্জগতে, কর্মজীবনে এ হাউসের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ---যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদের মধ্যে সেনা বিভাগের মেজর শমসের মবিন, মেজর কাজী আশফাক, শিক্ষা বিভাগের সালাউদ্দীন কাসেম (অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আইনুর রহমান (পদার্থবিদ্যা, রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়), এফ, এম, এ, সিদ্দিকী (ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), পি-এইচ-ডি ডিগ্রি অর্জনে নিয়োজিত মনিরুজ্জামান (যুক্তরাজ্য) ও কামরুল হায়দার (যুক্তরাজ্য),-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অত্র স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদানকারী জনাব তাজুল ইসলাম এ হাউস-এরই প্রাক্তন ছাত্র। তাছাড়া শিল্প, ব্যবসা, প্রশাসন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ হাউসের ছেলেরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। প্রতিটি ছাত্র প্রিয় ছাত্রবাসটিকে তার দ্বিতীয় সুখের নীড় মনে করে। তাই তারা ছাত্রাবাস তথা বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও পতাকাকে সমুন্নত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

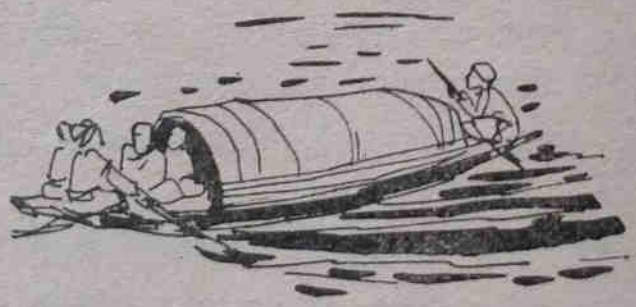

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাষ্টার ঃ জনাব শামছুল হক
হাউস টিউটর ঃ জনাব মনিরুজ্জামান
হাউস এলডার ঃ মাষ্টার বাহারুল আলম
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মাষ্টার কামরুল ইসলাম

ফজলুল হক হাউস ঢাকা রেন্সিডেসিয়েল মডেল স্কুলের প্রায় সমবয়সী এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত একটি ঐতিহ্যবাহী আবাসিক ভবন। বহু গৌরব ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর এই ভবনের বুকে ভাস্বর হয়ে আছে।

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এদেশের একটি অনন্য নাম। বাংলা ও বাঙালীর এই অনন্য ব্যক্তিত্ব, জন দরদী চিরঞ্জীব শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নামানুসারে এই ভবনটির নাম করণ করা হয়েছে—"ফজলুল হক হাউস"। এই হাউসটির দিকে তাকালেই এই ক্ষনজন্মা পুরুষের সমগ্র কর্মময় জীবন, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী, তাঁর অম্লান স্মৃতি নতুন করে আমাদের মনে জেগে উঠে। অকৃত্রিম মানব-প্রীতির এবং ন্যায় ও সত্যানুসন্ধান তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁর শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনের বহু ঘটনা অমিত বলবীর্য ও বাগ্মীতা এবং অনন্য সাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা এ দেশে কিংবদন্তিতে পরিণত হলেও তা নির্ভেজাল বাস্তব ও একান্ত সত্য। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভা ও চারিত্রিক গুণাবলীর যাদুস্পর্শে যাতে এ হাউসের আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করে সে উদ্দেশ্যই ছাত্রাবাসের এই নামায়ন। সে মহৎ উদ্দেশ্যে যে ব্যর্থ হয়নি তা এই হাউসের ছাত্রদের কৃতিত্বই তার জলন্ত প্রমাণ। রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—পুঁথিগত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সর্বস্তরের জ্ঞান লাভই তাদের একান্ত কাম্য। ফজলুল হক হাউসের ছাত্রবৃন্দ এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের গন্তব্যে এগিয়ে চলেছে। বিগত ১৯৭৬ সালের শিক্ষাবর্ষে এই প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম, সহপাঠ্যক্রম ও অন্যান্য বিবিধ কার্যক্রমে ফজলুল হক হাউসের বিভিন্ন কৃতিত্বের দিকে তাকালেই তা সহজেই প্রমাণিত হবে।

১৯৭৬ সালে ফজলুল হক হাউস সর্বোচ্চ পয়েন্ট লাভ করে স্কুলের বড়দের শাখায় চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করার গৌরব অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিষয় মোট ১৪ পয়েন্টের মধ্যে ফজলুল হক হাউস ১১ পয়েন্ট লাভ করে। পয়েন্ট বন্টন নিম্নরূপ ঃ—

১।	এ্যাকাডেমিকস্—	২
২।	আন্তঃক্রীড়া—	১

৩।	বাৎসরিক ক্রীড়া—	০
৪।	আজান ও কেরাত—	২
৫।	আন্তঃ হাউস পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা—	২
৬।	বহিঃক্রীড়া—	২
৭।	বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতা—	২
		মোট ১১

১৯৭৬ সালের শিক্ষাবর্ষে ফজলুল হক হাউসের কৃতি ছাত্র মাস্টার কামরুল ইসলাম (স্কুল নং—৭০৮) বিদ্যালয়ের শিক্ষক্ষেত্রে সর্বোত্তম ছাত্র (Best in academics) হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় গৌরব অর্জন করে। এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আবদুল্লাহ হেল সফী অধ্যক্ষের শীল্ড পাওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ফজলুল হক হাউস ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ এই দুই বৎসরই পর পর কলেজ প্রিফেক্ট নির্বাচিত হওয়ায় গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৬ সালে কলেজ প্রিফেক্ট ছিল মাস্টার আবদুল্লাহ্ হেল সফী এবং চলতি সালে আছে মাস্টার ওয়াজেদ সালাম (স্কুল নং ৮১১)।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এই হাউসের ছাত্রবৃন্দ তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৭৬ সালের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এই হাউসের ছাত্র মাস্টার সাইদুর রহমান (স্কুল নং ২১৮২) এবং স্কুলের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে সে পুরস্কৃত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই হাউসের দু'জন ছাত্র মাস্টার ইউসুফ কবীর (স্কুল নং ১০৩৭) ও মাস্টার আবদুল হালিম (২২৭৫) উল্লিখিত নাট্যানুষ্ঠানে চরিত্রানুগ অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করতে সমর্থ হয়।

ফজলুল হক হাউসের দেয়াল পত্রিকা 'প্রতিবিম্ব' হাউসের ছাত্রদের তত্বাবধানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনা এ হাউসের ছাত্রদের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় বহন করে। ১৯৭৬ সালের বার্ষিক তাঁবু বাসে ফজলুল হক হাউসের কৃতিছাত্র মাস্টার আবদুল হালিম (স্কুল নং ২২৭৫) চীফ মার্শাল হিসেবে তার সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করে এই হাউসের গৌরব বৃদ্ধি করে।

পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যক্রম ছাড়াও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমে ফজলুল হক হাউসের ছাত্রবৃন্দ তাদের স্বকীয় গৌরব ও কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে---১৯৭৬ সলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের দিকে তাকালে একথা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। ১৯৭৬ সালে ফজলুল হক হাউস থেকে মোট সতেরো জন পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এতে শতকরা ১০০ ভাগ পরীক্ষার্থী-ই উত্তীর্ণ হয়। উক্ত সতেরো জনের মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে, ১০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। একই সালে এই হাউস থেকে মোট ১৮ জন পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এতে পাশের হার ছিল শতকরা ৮৮./ ভাগ। অর্থাৎ ১৬ জন উত্তীর্ণ হয়। উক্ত ষোল জনের মধ্যে ৭ জন প্রথম বিভাগে, ৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফজলুল হক হাউসের ছাত্র মাস্টার শামীমুল হক ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত গ্রুপ-এর তৃতীয় স্থান অধিকার

করে নিজের ও হাউসের সুনাম বৃদ্ধি করে। সব চেয়ে গৌরবের কথা এ বছর এস, এস, সি, পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় মাষ্টার কামরুল ইসলাম প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ফজলুল হক হাউসের এই বিভিন্ন কৃতিত্ব ও গৌরব কোন ব্যক্তি বিশেষের একক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নয়—বরং সামগ্রিক ভাবে এই হাউসের আবাসিক, অনাবাসিক ছাত্রদের সম্মিলিত ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতাই এ গৌরব অর্জনের মূল চাবিকাঠি। সুতরাং এই হাউস সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও কর্মী নির্বিশেষে সকলেই ধন্যবাদার্হ এবং গৌরবের দাবীদার।

বিদ্যালয় সংবাদ

০ ১৯৭৭ সালের ঢাকা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় আমাদের কৃতি ছাত্র মোঃ কামরুল ইসলাম ছ'টি বিষয়ে লেটারসহ রেকর্ড নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু এটাই তার চরম কৃতিত্ব নয়। সুদীর্ঘ দশটি বছর আবাসিক ছাত্র হিসাবে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এখানে প্রাপ্তব্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সে তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সর্ব্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছে। আমরা মনে করি এটাই তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ফুটবল, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেবিল-টেনিস, ইত্যাদি যাবতীয় খেলাধূলায়, চারু-কারু শিল্পে, সঙ্গীতে, বিতর্কে, এমনকি নেতৃত্বেও সে অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মপালনে এবং আচার-আচরণেরও সে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। কামনা করি আল্লাহ্ তাকে যেন দশ ও দেশের মুখোজ্জ্বল করার মত তৌফিক দান করেন।

০ ১৯৭৭ সালের ঢাকা বোর্ডের এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় আমাদের কৃতি ছাত্র মোঃ আবুল বাসার, সাইদুর রহমান, মোঃ ইলিয়াস এবং মোঃ মাসুদ হাসান সম্মিলিত মেধা তালিকায় যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম, ত্রয়োদশ এবং অষ্টাদশ স্থান অধিকার করেছে। তাছাড়া মানবিক শাখায় কৃতি ছাত্র মোঃ আব্দুল হালিম খান ষষ্ঠ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে। আমরা এদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ'বছর মোট ৩৭ জন ছাত্র এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় অংশ নেয়। গৌরবের কথা, সকলেই কৃতকার্য হয়। এদের মধ্যে ২৭ জন প্রথম বিভাগে, ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে, এবং ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। উল্লেখযোগ্য যে, নয়জন ছাত্র স্টার মার্ক পেয়েছে।

০ এ'বছর ক্রীড়াশিক্ষক জনাব হেলালউদ্দীন আহ্মেদ পাতিয়ালা (ভারত) থেকে সাঁতারে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। এই স্থান থেকেই জনাব এম, এ, সালামও হকিতে ডিপ্লোমা লাভ করেন (১৯৭৪)। এঁদের দু'জনকে আমরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

০ বিদ্যালয়ের পতিত জমিতে এ'বছরও নিবিড় ধান চাষ চলছে। সুখের কথা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও এবার ফলন ভাল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

০ সমবায় পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের একটি ডোবাতে ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। আর একটা ডোবাকে আগামী শীতকালে মৎস্য চাষের জন্য পুষ্করিণীতে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

০ আন্তঃস্কুল সাঁতার প্রতিযোগিতায় আমরা মোট পাঁচটি বিষয়ে জয়লাভ করে জোনাল চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি।

০ আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় জোনাল চ্যাম্পিয়ানশীপ অর্জন করার পর ঢাকা শহর পর্যায় খেলাতে আমরা অংশ গ্রহণ করি এবং একটি খেলায় জয়লাভও করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে খেলায় অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হই।

শোক সংবাদ

মৃত্যু অনিবার্য, তবুও অবাঞ্ছিত। আরও বেশী অবাঞ্ছিত, আরও বেশী নিষ্ঠুর মনে হয় যখন সে এমন একটা জীবন ছিনিয়ে নেয় যে জীবন রূপ-রস-গন্ধে ভরে ওঠেনি, সুশোভিত হয়নি ফুলে ফলে। এমন একটি নিষ্ঠুর, করুণ, মর্মান্তিক অপমৃত্যু আমাদের সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, সমগ্র সত্তাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। গত ১৯।৯।৭৭ তারিখে এই অকাল মৃত্যুর শিকার হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় ছাত্র শেহজাদ রওনক চৌধুরী, দশম শ্রেণী, মানবিক শাখা (ইন্না-লিল্লাহে-------রাজেউন)। তার মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুতে অধ্যক্ষ, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ মর্মাহত, স্তম্ভিত। বিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবেশে শেহজাদ রওনকের রূহের মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং একমাত্র সন্তানহারা পিতা-মাতাকে পরম করুণাময় আল্লাহতালা যেন শোক বহন করার মত তৌফিক দান করেন—এই মোনাজাতও করা হয়।

মৃত্যুর হিম-শীতল কঠিন নিষ্ঠুর হাত স্পর্শ করেছে আমাদের প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র এ, কে, এম, আনোয়ারুল ইসলামকে (ইন্নালিল্লাহে-----রাজেউন)। ইনি গত ২৬।৯।৭৭ তারিখে কুমিটোলা বিমান ঘাঁটির সন্নিকটে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। তার অকাল মৃত্যুতে আমরা হারালাম একজন কৃতি ছাত্রকে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একজন উদীয়মান ফ্লাইং অফিসারকে। আমরা সর্বান্তকরণে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং সেই সঙ্গে জানাচ্ছি শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি।

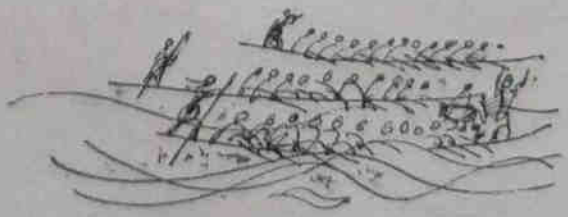

রেসিডেন্সিয়েল মডেল স্কুল, ঢাকা

ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ			
১৯৬৪	২০	৬	৯	৫	১০০	৮	—
১৯৬৫	২১	৬	১২	৩	১০০	১১	—
১৯৬৬	২২	৭	১৩	২	১০০	৯	চতুর্থ (সম্মিলিত)
১৯৬৭	২৩	১০	১২	১	১০০	১৯	—
১৯৬৮	২০	৮	১১	১	১০০	২০	ত্রয়োদশ (সম্মিলিত)
১৯৬৯	৩৫	১০	২৩	২	১০০	২৯	—
১৯৭০	৩২	১২	১৭	৩	১০০	২৭	—
১৯৭১	২১	২০	১	—	১০০	৩২	—
১৯৭২	২৫	২০	৫	—	১০০	৩৯	একাদশ (সম্মিলিত)
১৯৭৩	৩৮	২৪	১২	—	৯৫	৪৬	পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (সম্মিলিত)
১৯৭৪	৫১	১২	১৫	১৫	৮২	৩৪	দশম, ও পঞ্চদশ, (বিজ্ঞান), ৮ম (মান)
১৯৭৫	৪৪	১৬	১৫	৮	৮৮·৬০	৩১	—
১৯৭৬	৪৫	১০	২১	২০	৯২·৭২	৩৪	—
১৯৭৭	৪৮	১৬	২৫	৪	৯৩·০১	৪৯	প্রথম (সম্মিলিত)

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ-মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

১৯৬৯	২৪	১৯	৪	১	১০০	১১	—
১৯৭০	২৭	১৮	৫	৪	১০০	১	—
১৯৭১	৩৫	৩৫	—	—	১০০	৪০	—
১৯৭২	৪০	২৭	১৩	—	১০০	১৬	—
১৯৭৩	৬২	২২	৩৮	১	৯৮	৩	—
১৯৭৪	৪৯	১৬	১৭	১৪	৯৬	৬	প্রথম ও নবম (সম্মিলিত)
১৯৭৫	৫৭	৬	২০	১৬	৯১	৬	তৃতীয় (সম্মিলিত)
১৯৭৬	৩৭	৮	১৫	৩	৭০·২৭	২	—
১৯৭৭	৩৭	২৭	৮	২	১০০	১৪	সম্মিলিত মেধা তালিকার ৬ষ্ঠ, ৭ম ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ স্থান এবং মানবিক শাখায় ৬ষ্ঠ স্থান

English Section

FLYING SAUCERS FACT OR FANTASY

SALAHUDDIN AHMED
School No. 609, Class XI Sc.

There are only a few people who do not know what a flying saucer is, Is it a fantasy, a dream that will never come true ? It is very hard to imagine people walking through space at their sweet will. The attitude of people is now blatantly sceptical as it was at the dawn of aviation.

These have been sighted without complete confirmation over various parts of the world, specially over America, Britain and Australia. President Carter has formed a commission to enquire about the unidentified flying objects (U.F.O.). It is said that they are of the shape of a cigar with an eerie glow all around. Some have bulging tops and a weird glow beneath and all around them. The sound they make is very low and it is not possible to conceive them. They can glide, slide side ways, rise vertically, drop down or even turn around 3600/.

Even the prestigious magazine the Reader's Digest published an article a few years ago under the caption Flying Saucers Fact or Fantasy. There it was written that the policemen had reported about the sighting of saucers. Fighter planes were sent to investigate. One pilot reported that he had seen it. The feats it performed baffled every one's imagination. No direct contact has been made and no green man with the gun of ray has come out of the flying machine. In short the relation has been far from being hostile. Is this a mere myth or a fabrication of a fertile brain ?

Let us look at from different angles Man has achieved so much technological advancement that by simple spectroscopic analysis he can find out the essential composition of the sun, stars, millions and millions of light years away. Stars from where light is yet to reach the earth have been detected and their composition determined. Even the invincible moon has been conquered. Certainly, with such an advanced knowledge it is possible to make contact with such mysterious bodies. The largest radio telescope in Mexico is projected towards the heaven to detect some signs, some messages from the far off beings who are capable of such transmission. But today everything is silent. The heavens seem very dark, empty and void.

Life exists on the earth, on its surface, a few miles adove and below. Of all the living organisms only man is capable of going against nature and of thinking rationally. Ours is the third planet from ihe sun, in our solar system. Who will count how many solar bodies there are ? Can sands on the sea shore be counted ? Such is the creation of God. Is it not an utter foolishness on our part to assert that in vast creation we are the only intelligent beings ? After all we are pigmies on the earth. Our vision is short, we are so little, so insigntficant that it nearly makes us wish we were dead and did not exist at all. Protoplasm is the basic thing of ourl ife. The R.N.A and D.N.A have their unique structures because of the unique property of carbon atom. Carbon atoms can form complex structure. Our bodies are based on this system and evolution has taken place so as to make Oxygen a dire necessity. Nitrogen is partially required but Carbondioxide is harmfui to us, Silicon too has properties similar to those of Carbon. So evolution may take place in lives based on silicon. Perhaps coldness will be es sntial to them as heat to us. There is nothing impossible on the earth. If this were true then ostensibly the universe would not be so lonely a place as one would imagine and we would not be so very lonely. Our existence would receive a new meaning then.

If they are out there why haven't we met them ? Are we not ready for them or vice versa ? Are they hostile or friendly ? Are they really there ? Is the void a reality and are we the only creation of the Creator ? These questions agitate our hearts.

if there are vehicles at all they must be revolutionary in design. These are unthinkable to us as atc mic submarine was unthinkble to our forefathers only a century ago. But for that reason we should not grow sceptical. Today it is a reality which was a dream yesterday. The whole conception of Newtonian mechanics has been completely changed by Einsten's Theory of Relativity and its mass energy equation. Everything changes. So my friends, keep an open and warm heart. Do not be despondent. Wait till you accost your green friends from the Mars or any other planets alighting from a flying saucer.

THE LOST ILLUSION

M. M. BARKATULLAH
S.S.C. CANDiDATE
School No. 1211

It was 10 A.M. Sitting in his new office, situated by the side of the Dhanmandi lake, detective Elahi was eagerly awaiting a client. But he was having a view of the choppy lake through the window in such a pensive mood that a stranger would be led to belive that Elahi was composing a poem. Of course his friends would think that he was concocting a new story regarding himself. After all, he was adept in that art.

This long awaiting was soon over. Mr. Hafizullah, a body builder, strutted into the room and thudded on the sofa without being cheered by Elahi.

"My name is Hafiz Miah", he broke the silence after a while.

"My grandfather's wrist watch is missing from the bed room."

Elahi, "I do not take up any case without money. You have to pay Taka one hundred in advance in addition to usual fifty Taka per day."

Hafiz Miah, "Of course, he-r-e-is your hundred and fifty."

Elahi, "Do not worry. I will find out the watch."

Hafiz "When you are calling at my house ?

Elahi, "Now."

Hafiz Miah, "Very good, let's go."

At house Elahi was intorduced by Hafiz Miah to every body present there ; his wife, servant and house maid. Scanning every one like a typical detective, he asked "Do you suspect anyone, Hafiz Miah?"

Hafiz Miah, "As a matter of fact I do not know whom to suspect."

Elahi, "Every body except yourself."

Then singling out the servant he said, "Go out side and wait for me,"

Elahi, "What is your name ?"

Servant, "Ka-are-e-m."

Elahi, "How long you have been serving Mr. Hafiz ?"

Servant, "Since day before yesterday. Before that I had been learning judo and I am a blackbelt."

Elahi, "you stole the watch."

The servant could not maintain his mental balance. All on a sudden he gave Elahi a good slap on his cheek. The attack was so sudden that out of fear, Elahi ran into the garden behind the kitchen. There was a hole in the garden. Elahi stumbled there. His hands reached the hole and he felt the touch of something hard. It turned to be the wrist watch. At once Elahi forgot everything. He ran upto Mr. Hafiz and showed him the watch in the victrolous mood, 'This is your watch. Did I not tell yout hat I would find it out. After all, I am detective Elahi.' But as ill luck would have it, Mrs. Hafiz had seen every thing from the kitchen. She opened her mouth, "I have seen every thing. it is just a chance that you have found that watch. There is nothing to swell your heart. Had I run like you I would have found the watch."

Elahi tried to say something. But intense pain in the jaw forced him to change his mind. He silently walked out of the house cursing the servant. The illusion of being a real detective was, at last.

A MOONLIT NIGHT

JAVED BARKATULLAH
Class X, Science
School No. 1221

Oh ! What a beautiful sight
Offers a moonlit night.
On mind it leaves impression so abiding
This scene's so exciting.
The nature so gay and festive seems
Under the soothing moon beams.
The specks of clouds are light white
By the silvery light.
On the calm river the moon beam plays
And tinges the water with silvery.
The boatman inspired by this mysterious beauty
Fills the air with rustic melody.
And I wandering along country side, view
And bewildered ; I exclaim ; "when !
How amazing marvellous creation of God
with we are endowed."

IN RETROSPECT

MD. QUMRUL ISLAM
S. S. C. Candidate
School No. 702

I still vividly remember that bright sunny day.

It was the 20th January, 1967, when I arrived with my parents to my Alma Mater in order to begin a new life, the hostel life indeed. All my belongings were with me for I was a new intake. I could not believe that I was really on the verge of making a new beginning. An indescribable feeling seized me. Other new intakes began to arrive gradually. All the formalities over, I was given the green signal to get inside and had to take leave of my parents. At that moment I saw other fellow friends sobbing and wailing. But I do not know why I didn't cry on that day. Father and mother blessed me. Bidding salam to them I got inside my new boarding house. I cannot recollect what happened next. But still I remember that I was placed in a big dormitory having an accommodation for 26 boys of my age. I was also given a small locker and a small bed as you can guess what a boy of class one deserved. Just in that afternoon we, the new intakes, were taken to the playground where other hostel boys had already been out to play. As I was not a good player, I couldn't dare join them. I just watched and enjoyed what others played.

This was how my hostel life began. As days rolled on, I began to come closer to my fellow companions. I talked to and played with them and felt better in no time. In the class-room my fear also left me because of our teachers loving care and affection. Soon another trouble arose for I was often called the "chosen one" by some stronger class mates which I never liked to hear. But I had no way to escape from them.

Soon the annual atheletic meet of our school began. Though I participated in almost all the events and tried my best, unfortunately I didn't get any prize. You can not guess how unhappy and sad I was when I saw many other boys receiving prizes on the day of prize giving ceremony. I and other friends of mine wept and became determined to win prizes next time.

I think it won't be exaggeration to state here that from then onwards the number of prizes I received each year never fell below twelve.

As days elapsed, I went ahead with my studies. My joy knew no bounds when in the Ist terminal examination I topped the list. It was a unique victory. You do not know how glad my parents and teachers were. From that day, I became the apple of every one's eye.

Side by side with our studies we used to take part in many co-curricular activities. It was in class three that I joined cubbing. You cannot imagine what a tough fight I had to fight for this. For I had to prove myself worthy of joining the cub pack. Afterwards I spent many pleasant days in cubbing and scouting before I joined the school band party. In class three we brought out our class magazine. Its name still rings in my ear, "The Focus on Talent". It was really a magazine of the boys, by the boys and for the boys. It was appreciated by all.

In the hostel, I came in touch with many pious boys and in no time I began to say my prayers regularly. With the passage of time, I began to have deeper faith in Allah, the Almighiy, who can make anything out of nothing and transform our dark yesterday into bright tomorrow. From His hand flows all that is best.

Such were the days of my past. Like a meandering river, days rolled on amidst joys sometimes mingled with unknown fear and sorrows. I believe I have spent the best part of my life here in this institution. It was in this school that we learnt, played and experienced what is necessary for the stern realities of life. This Alma Mater of ours has lit the eternal flambeau of knowledge in the very core of each heart. It is because of this that the more I study the more I have the feeling that I have miles to go.

The past is always golden. The sweet reminiscences of childhood is a priceless possession. Now-a-days when I get tired of the present I seek relief in the sweet past. As I look back, a host of innocuous memories crowd upon my minds. I ruminate them and want to get back those carefree days again. But the harsh realities soon hurry me back to despair. For those days are gone...gone forever, never to come back again. An unheard cry only comes out from the core of the heart—how green was the valley of my past.

RECOLLECTION OF THE CAMPING

FARUQUE HOSSAIN
Class X. Sc,
School No. 1033

Though our annual camping of 1976 at Rajendrapur has long been over, yet I am under the spell of it. It is really a very uphill task to forget it. Camping is an annual feature of our school. Every year in the beginning of new session we go out for camping far away from the din and bustle of city life and refresh ourselves amidst the green forest. Besides refreshing ourselves, camping prvides an ample opportunity to prepare ourselves for the future and cultivates in us a high sense of dignity of labour as well. In camping we have to do everything ourselves and thus we practically learn the lesson of self-reliance. We go for hiking and thus we see our countryside, meet the local people and thus we can know the problem of our country. During the obstacle race we cross so many obstacles. It simply reminds us that in practical life we have to cross so many hurdles.

This year, I had the pride privilege of being included in the advance party. We left for the site on the 18th January. Some of my friends and four teachers were there in our advance party. The school bus went there, disgorged us there and came back to Dacca. We were cut off from the main stream of humanity. The sun set and the jackle started howling. I had the feeling of being one of the paratroopers who are airdropped in alien land for making necessary arrangements so that the advancing column by land can join them smoothly. We pitched tents and did all the preliminary works. On the following day all the campers and teachers arrived and found every thing ready. I had the utmost satisfaction that I had also contributed my mite towards making the camping a success.

As usual, hikng, rifle training, cross-country race, obstacle race, scouting cooking, campfire, etc were the main items of the camping. Every time there was inter-group competition. When the judges (obviously our teachers) would come, every group leader would try to convince the judges of the superiority of his group over other groups. I having been the group leader of the Colonel Rahman group, can say what an enthusiasm to do the best had seized us. It seemed as though the floodgate of youth, joy and vigour had been

flung wide open and the seamy sides of life had been banished. Oh, those were the days of joy. We had hardly any opportunity to sleep. We worked, worked and worked and yet we did not feel exhausted even for a moment. The more we worked the more we enjoyed.

Another happy aspect of the camping was that there students and teachers had come closer to one another. Teachers were friendly with us. Salam Bhai with his familiar voice and Amjad Bhai with his cheerful face were with us all along. Of course, one desire of us remained unfulfilled. We cherished a desire that Salam Bhai should participate in the obstacle race and pass through the tube with his giant figure. Eusufzai sir showed us documentary films. We hope in future he will show us more enjoyable films. Omar Ali sir in his khaki uniform and hat on head and staff in hand was the cynosure. Diminutive as he is very frequently he would become invisible behind the drums of water. Nobody saw him leaving his kitchen before 9 P. M. His "PARTNER" Shamshul sir would carefully guard his stores every time. He was busy balancing gross and net weight of foodgrains while Tajul Islam sir would take stock of mugs, plates etc. Our reverend Vice Principal set up an example of hard work. He was with us during the morning P. T. He was shooing off 'BAGDASHA", He was singing. He was everywhere.

The most interesting item was campfire. The flame of the campfire would teach us to burn the dry emotion and filth of our life. It would also teach us to look towards heaven in our lives. During the campfire we would get hold of our sirs. Throughout the year they ordered and we obeyed, but at campfire we were the monarchs. We would derive utmost pleasure by outwitting the sirs by suddenly annoucing their names for mirth and joy With trembling feet and nervous voice, they would sing and we would derive pleasure from that. We got maximum pleasure from the fun of Mr Ahsanullah and Mr Omar Ali.

The campfire over, we would retire to the tents. But sleep could not overpower us, Lying on beds I would indulge in talking with my chums and thus we would spend the night. Outside the tent, our Zahurul Huq sir, Azadul Kabir sir, Tajul Islam sir, Mushtaq sir, Alamgir Kabir sir, Salam Bhai and marshals Salauddin Bhai, Manirul, Wazed, Faruque, Hassan and others would sit around ember, indulge in confabulation over cups of tea. They would pass night in that way. From time to time jackles would start their concert, What our sirs and marshals were talking about throughout the whole night? What we talked about inside the tent? Really I do not remember now. But then it seemed as though the confabulation would never come to an end.

At dusk, we were in the habit of walking aimlessly in the jungle or in the field. One evening after dinner, I went to the cemented steps of pond and sat there. The queen moon was there in the sky. Darkness had wrapped the jungle. That darkness coupled with the soothng beam of the moon made the surrounding strangely beautiful. Trees appeared to me as living entities. Campfire had begun by that time. But I was withdrawn from the surrounding. I was lost in the realm of thought. Many sweet and desultory memories of the past came crowding upon my mind. I enjoyed the bliss of solitude like Wordsworth.

The day of departure arrived. Our Principal announced the closing of the camp. We dismantled our tents and with a heavy heart left for Dacca. But the memory of that camp is still fresh in my mind.

THE INFLUENCE OF ENGLISH ON OUR LITERATURE

Mushtaq Ahmed Manik
Lecturer,

Whatever may be the negative aspect of the British rule in Bharat, there is no gainsaying the fact that with the advent of the British rule, our literature issued from the blind alley of medievalism to the boulevard of modern age. The most significant steps of the British rule effecting language and literature were the introduction of English as the medium of instruction and the setting up of printing press. English became the casement through which the Indians had a peep into the core of Europe which had been at the height of literary, cultuaral and scientific achievement. The western education broadened the outlook of the Indians and liberated their minds from the fetters of ignorance, and superstition.

During the medieval age, one could hardly find the reflection of life in our literature. prose was unknown to our litterateurs who only composed devotional songs extolling goddesses like Chandi, Manasha and others.

As the British established their capital in Calcutta, Bengal became the pioneer of this intellectual revolution. The Christian missionaries started preaching the message of the Christ among the natives by publishing pamphlets in Bangla. In 1809 clergyman William Carey published the Bangla version of the Bible and thus laid the foundation of Bangla prose. The introduction of Bangla prose was a significant land mark in the history of our literature since it foreshadowed Bangla novel. Fort William College and Hindu College (present Presidency College) were established in Calcutta in 1800 and 1817 respectively. With these two colleges as nucleus there was a flurry of literary activities in the early part of the last century. Newespapers began to spring up in increasing number. Modern literary forms such as novel, drama, short story, sonnet also came from the west through the channel of English. But unfortunately owing to some historical and psycholgical reasons, the Bangeali Muslims kept themselves aloof ftom that renaissance.

Raja Ram Mohan Roy, founder of the modern school of Bangla fiction, sought to synthesize the oriental and the occidental philosophy. The year 1858 marks a turning point in the history of Bangla literature. In that year Ishwar Chandra Gupta standing at the crossroad of the medieval and the modern age died, Again in that very year the first Bangla novel "ALALER GHORER DULAL" (The spoiled child of rich parents) by Tekchand Thakur was published. It was redolent of Pickwick Papers of Charles Dickens. Again, in that 1858 the first succssful Bangla drama after the western style "SHARMISHTA" by Michael Madhusudan Dutt was staged.

Bankim Chandra Chaterjee, though notorious for his parochial outlook is rightly called the "literary emperor." Deeply influenced by the English novelists like Sir Walter Scott, William More and others Bankim introduced the English romantic and chivalric element in Bangla novel. He also introduced patriotism as a theme in our literature. His romantic novel DURGESH NONDINI has been written on the theme of Scott's Ivanhoe. His second romantic novel KOPALKUNDOLA is really a masterpiece. The young maiden Kopalkundola on the shore of the secluded sea reminds us of Shakespeare's Miranda.

Shakespeare caught the imagination of the young Bangali writers who wanted to emulate him. Ishwar Chandra Vidyasagar's humorous novel VRANTIBILASH is but a Bangla reproduction of Shakespeare's Comedy of Errors.' Dramatists like Har Chandra Ghosh, Sattendranath and others also composed dramas with the themes of the plays of Shakespeare.

Michael Madhusudan Dutt is the pole star that will ever shine bright in the literary firmament of Bengal. A rebel, he broke the shackle of the convention and extended the literary frontier beyond the contemporary imagination. He enriched our literature and infused a sense of dynamism in it by introducing sonnet, blank verse, and drama. Like Shakespeare Madhu also unlocked his heart with the key of sonnet. He wrote not only with the Indian tradition, in his marrow, but also with the whole literary tradition of Europe. If one scans his line one can easily feel the influence of Homer, Virgil, Tasso, Boccaccio, Dante, Milton and others on Madhu. With sincerity and sympathy, he dived deep into the hearts of his characters and depicted their complex psychological problems, heart anguish and excruciating pain. Like the Greek characters such as Aegisthes, Agamemnon and others, Madhu as well as well as his characters too seem to be guided and conditioned by the cruel and inexorable fate.

His MEGHNAD BADH KABYA is a literaray epic like Miltion's PARADISE L OST. His Ravana reminds us of Milton's Satan. PADMABATI, his another play is based on the Greek episode of the apple of discord. In TILOTTOMA KABYA Madhu retold an Indian story in European style. He delineated his gods and goddesses in BROJANGANA KABYA in the same way in which Keats delineated his gods and goddesses in Hyperion. Madhusudan's newly created Tilottoma is redolent of Milton's newly created Eve. Around the same time Biharilal brought about a revolution in the domain of lyrics.

Among the dramatists of the nineteenth century, Dijendra Lal Roy towers inches above his contemporaries. His dramatic works betray his indebtedness to Shakespeare. Like Shakespeare's dialogues his dialogues too are long and verbose. Like Shakepeare's, his dramatic soliloquies too sound moral depth. His best dramatic work SHAJAHAN is an example. Here we find Shahjahan not as an emperor, but as a father whose heart has been lacerated by the ingratitude of his son. In the charecter of Shahjahan we find the shadow of Lear of Shakespeare. Like Lear, Shahjahan too threatens to destroy the world. This springs from utter frustration. He made use of the Seakespearean fools and clowns in a very successful way. Again he was a satirist and like Dryden, Pope and Byron impugned his literary rivals and critics with whetted words.

Though Rabindranath Tagore is known as a poet, he in fact contributed profusely to every branch of literature. He built a mighty edifice on the foundation laid by William Carey. Influenced deeply by the western conception of humanism and nationalism, Tagore sang of the land and people of his country. In his short stories he depicted the very soul of rural Bengal. One can feel the pules of Bengal beating there. He considered human beings, not as Hindus or Muslims, Indians or non Indians. In his poem BHARAT TIRTHA he imagined India as the seashore of great humanity and invited the Aryans, the non-Aryans, the Hindus, the Muslims, the Sakas, the Huns, the Pathans, the Mughals to assemble in that seashore of great humanity. His sense of all embracing humanism assumes a radical dimension in his novel Gora where his character Gora says, "Teach me the lessons of that God the doors of whose temple are never slammed aganist the Hindus or the Buddhists, the doors of whose temple remain ever open to all," Like Wordsworth, Tagore too looked upon nature as a living entity, Like Shelley he was a revolutionary poet and like Keats, he was a poet of beauty. The themes of Tagor's VORSHOSHESH and Shelley,s 'Ode to the West Wind' are almost identical.

Nazrul, the Byron of Bengal also sang of humanity and raised his voice

against all sorts of injustice and ugliness like Tagore. But while Tagore is slows moving river, Nazrul is a cataract.

Almost all the writers of the twentieth century were influenced by the English writers in some way or other. Poets like Auden, Yeats, Eliot ushered in a new era in English literature in the post war (First war) England. Influenced by the modern English poets the young Bangali, poets like Buddhadev Basu, Amiya Chakrvarty, Vishnu Dey, Humayun Kabir, Jibananda Das and others initiated a new movement in Bangla literature in the thirties of this century. Their movement brought about a radical change in our literature.

At that time the Hindu-Muslim antagonism was granulating. The Muslims, influenced by the Irish revival movement of this century began to create literature by exploiting the age old myth and legends that had been rooted in tradition, land and religion. Like Yeats, Faruque Ahmad exploited the old myths very successfully. As a result the Bangali Muslim literature assumed a distinct charateristics. Nevertheless, at the same time it is the essential part of Bangla literature just as the Irish literature, despite its distinctive feature is an integral part of English literature. This Bangali Muslim literature ultimately flowered into the Bangladeshi literature. The Bangladeshi writers are now influenced not only by the English literature, but also by the literatures of the whole of the world. But the channel remains the same—English.

Though our litterateurs have been borrowing copiously what is best from English and other continental literatures, they have not sacrificed the distinctiveness of our own literature. The stream of Bangla literature did never lose its way in the quicksand of plagiarism and blind emulation. This speaks volumes for the dynamism of our langunage, literature and culture.

ADMINISTRATIVE STAFF

1.	Colonel Ziauddin Ahmed, M. Sc.	—	Principal
2.	S.M.Z. Hoq. B.Sc. Honours, M.Sc. Trained in the U.K. in pub. school teaching and administration.	—	Vice Principal
3.	Mrs, Shahanara Begum, B.A.,B.T.	—	Headmistress
4.	Mr, A.K,M. Feroz Ahmed Chowdhury, B.Sc.,M.A., Dip-in-Edn.	—	Bursar.
5.	Mr. Abdul Latif, M.B.B.S.	—	Medical Officer
6.	Mr. Shilabrata Chowdhury, M.A. in Library Science.	—	Librarian

TEACHING STAFF.

1.	Mr. A.K. Azadul Kabir, M.A. (Double)	—	Senior Lecturer
2.	,, Md. Shamsul Hoq, M.Sc.	—	,,
3.	,, Sk. Md. Omar Ali, M.A,B.T. Dip-in-Eng. Teaching (Lon).	—	,,
4.	,, M. Ahsanullah, M.A.,B. Ed.	—	,,
5.	,, ASAIK Eusufzai, B.A. (Hons.) M.A. Dip-in-Eng. Teaching (U.K.) Sophomore Course in Ed. (Beirut)	—	,,
6.	,, Kazi Rezaul Islam, M.A.	—	,,
7.	Mrs. S.J. Mansur, M.A.,B.T.	—	,,
8.	Mrs. R.N. Huque M.A.,B. Ed.	—	,,
9.	Mr. A.K.M.A Mannan, M.A. (Ed.)	—	,,

1.	Mr. Md. Anwar Rahman, M.A.	—	Jr. Lecturer
2.	,, P.K. Guha Neogi, M.A.	—	,,
3.	,, Md. Ataul Haque, M.Sc.	—	,,
4.	,, Tajul Islam, B.A. Hons. M.A.,LL.B.	—	,,
5.	,, Md. Shahjahan, M.Sc.	—	,,
6.	,, Abdur Razzak, M.A.	—	,,
7.	,, K G Murshed M.Sc	—	,,

8.	Mr. Dulal Barua, M.Sc.	—	,,
9.	,, Matiur Rahman, M.Sc., B.Ed.	—	,,
10.	,, Mushtaq Ahmed, B.A.Hons.M.A., LL.B.		,,
11.	,, Md. Golam Murtaza, M.Sc.	—	,,
12.	,, Shamsur Rahman, M.A. (Double), M.Ed,		,,
13.	Mrs. D.R. Islam, M.A., B.Ed.	—	,,
14.	Mr. A.B.M. Abdul Mannan, M.A., M.Ed.	—	,,
15.	Mss. Hasna Aziz, M.A.	—	,,
16.	,, Ronshan Ara Bhgum, M.A., B.Ed.	—	,,
17.	,, Shamim Rahman, B.A., B.Ed.	—	,,
18.	,, Dilara Begum. B.Sc., B.Ed.	—	,,
19.	,, Umme Salma Chishti, M.A.	—	,,
20.	Mr. M. Aminul Islam, Dip. in Fine Arts	—	Assistant Teacher (Art)
21.	,, K.K. Sarkar, Dip. in. Commercial Art.		jr. Lecturer (Craft)
22.	,, Helaluddin Ahmed, B.A. Dip-in-phy Ed. Dip-in-swimming (Patiala), India.		Lecturer (phy.Edn.)
23.	,, A. Jabbar, B.Sc.	—	Demonstrator,
24.	,, Md. Ahia, B.Sc. LL.B.	—	,,
25.	,, M.A. Salam, Dip. in Hockey (Patiala), India		Asstt. P.T.I.
26.	,, Z.H. Mahboob Amjad Certificate in Phy. Edn.		,, ,,
27.	,, Abu Taher, Ex-E.P.R, (Band Master)	—	,,
28.	,, Md. Loqman Ahmed, M.M.	—	,, Moulavi
29.	,, Mvi. Md. Hemayetuddin Ahmed B.A. Hns., M.M,		,,

MINISTERIAL AND OTHER CLASS III STAFF.

1.	Mr. M.A. Sukur	—	Supdt. cum-Accountant
2.	,, M.A. Hasib	—	Head Assistant
3.	,, S.j. Mazumdar	—	Secy, to the Principal
4.	,, J.C. Roy,	—	Compounder/Pharmacist
5.	,, Habibur Rahman	—	,,
6.	,, S.M, Mujibur Rahman	—	Sr. Clerk
7.	,, Md. Ainul Islam	—	,,
8.	Mrs. S. Alam	—	Matron
9.	,, S. Nahar Choudhury	—	,,
10.	Mr. Rustam Ali	—	Steward
11.	,, Md. A. Latif	—	Asstt. Steward
12.	,, Sekandar Ali Meah	—	T.B. Steward
13.	,, Sk. Azizur Rahman	—	jr. Clerk
14.	,, P.D. Paul	—	,,

15.	Mrs. Md. Hazrat Ali	—	Care-Taker
16.	,, Bashir Ahmed Sarkar	—	Lab. Assistant
17.	,, Dewan Fazlul Karim	—	Asstt. Steward
18.	,, Md. Shahidullah	—	Jr. Clerk
19.	,, Mizanur Rahman	—	,,
20.	,, M.A. Halim Meah	—	Cataloguer
21.	,, H.M.A. Mannan	—	Ground Supdt.
22.	,, Md. Khalilur Rahman	—	Jr. Clerk
23.	Miss Afroza Begum	—	,,
24.	Mr. M.A. Baten	—	,,

———